'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'
সমাজশিক্ষা
৬৫ বর্ষ, জানুয়ারি ২০২২, পৌষ–মাঘ ১৪২৮
লোকশিক্ষা পরিষদ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর

স্বামীজীর পৈত্রিক ভিটে

সমাজশিক্ষা

SAMAJSIKSHA

রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রামোন্নয়নমূলক একমাত্র বাংলা মাসিক পত্রিকা

৬৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

জানুয়ারি ২০২২ : পৌষ–মাঘ ১৪২৮

‘সমাজশিক্ষা’ দপ্তর

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা–৭০০ ১০৩

Phone : 033-2427-4300/4500/4502 (Extn. 534); Fax : 2477-2070

E-mail : rkmsamajsiksha@gmail.com

১০১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯–স্থিত এ. জি. প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদক, ইনস্টিটিউট অফ সোসাল এডুকেশান অ্যান্ড রিক্রিয়েশান, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা ৭০০ ১০৩ থেকে ব্যবস্থাপক সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

ডি.টি.পি.–তে অক্ষর বিন্যাস, প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ : রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ।

Managing Editor : Swami Sarvalokananda, Editor : Swami Ishtavratananda, printed by Swami Sarvalokananda at A. G. Printers of 101 Baithak Khana Road, Kolkata-700 009, published by him for Secretary, Institute of Social Education and Recreation at Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, Kolkata-700 103, West Bengal.

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

নরেন্দ্রপুর, কলকাতা ৭০০ ১০৩, ফোন ঃ ২৪৭৭ ২২০৭

সমাজশিক্ষার ৬৫ বছর

সমাজশিক্ষার বিজ্ঞপ্তি ও চাঁদার হার ঃ

	এক বছরে			তিন বছরে			১৫ বছরের আজীবন সদস্য			২০ বছরের পৃষ্ঠপোষক সদস্য		
কিভাবে নেবেন	প্রকৃত মূল্য	আপনি দেবেন	সাশ্রয়	প্রকৃত মূল্য	আপনি দেবেন	সাশ্রয়	প্রকৃত মূল্য	আপনি দেবেন	সাশ্রয়	প্রকৃত মূল্য	আপনি দেবেন	সাশ্রয়
হাতে (১১+১ সংখ্যা	৩৬০ টাকা	১৮০ টাকা	১৮০ টাকা	১০৩০ টাকা	৫০০ টাকা	৫৩০ টাকা	৫০০০ টাকা	৩০০০ টাকা	২০০০ টাকা	৭২০০ টাকা	৪০০০ টাকা	৩২০০ টাকা
সডাক (১১+১ সংখ্যা	৩৯০ টাকা	২০০ টাকা	১৯০ টাকা	১১৭০ টাকা	৫০০ টাকা	৬৭০ টাকা	৫৮৫০ টাকা	৩০০০ টাকা	২৮৫০ টাকা	৭৮৮০ টাকা	৪০০০ টাকা	৩৮৮০ টাকা

এছাড়া—প্রতি সাধারণ সংখ্যার দাম—২০ টাকা, শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী সংখ্যা (মার্চ মাসে)-র দাম—৩০ টাকা, কৃষি সংখ্যা (জুন মাসে)-র দাম—৩০ টাকা, এবং শারদীয়া সংখ্যা-র দাম—১০০ টাকা।

Registered ডাকে নিতে হলে প্রতি সংখ্যায় অতিরিক্ত ২৫ টাকা দিতে হবে ২০২১-র জানুয়ারি থেকে।

'সমাজশিক্ষা' পত্রিকার গ্রাহকভুক্তিকরণ ও নবীকরণ হবে প্রতি বছর জানুয়ারি ও এপ্রিল থেকে। পুরাতন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে পত্রিকা-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য 'গ্রাহক নম্বর' বাধ্যতামূলক। অনুগ্রহপূর্বক গ্রাহক নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করবেন। গ্রাহক নম্বর ছাড়া কোনোরকম পরিষেবা আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক।

যে কোনো অর্থ চেক-এ গ্রহণ করা হয় এবং সঙ্গে আধার কার্ড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। দয়া করে M.O. করুন। M.O.-তে message-এ লিখবেন 'Samajsiksha Subscription' এবং পুরোনো গ্রাহকরা অবশ্যই গ্রাহক নম্বর দেবেন।

সম্পাদক
'সমাজশিক্ষা' পত্রিকা।

জানুয়ারি, ২০২২

সমাজশিক্ষা পত্রিকার গ্রাহক / সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনপত্র

সম্পাদক, সমাজশিক্ষা,
রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কোলকাতা – ৭০০ ১০৩

মহাশয়,

আমি সমাজশিক্ষা পত্রিকার ১ বছর/৩ বছর/আজীবন/পৃষ্ঠপোষক সদস্য হতে ইচ্ছুক। এজন্য চাঁদা বাবদ মোট .... টাকা (চেক/মানি অর্ডারে) পাঠালাম। ইংরাজী .... ২০ মাস থেকে ডাকযোগে পত্রিকা নেব। নীচে আমার নাম ঠিকানা দিলাম। ধন্যবাদান্তে—

Name : .... *Phone :* ....

Address : ....

District : .... *Pin :* ....

Date : ....

....
(Signature)

[Cheque / Draft must be drawn in favour of 'RAMAKRISHNA MISSION ASHRAMA, NARENDRAPUR]

নূতন ও পুরোনো চাঁদা অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন !

সূচীপত্র

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বলোকানন্দ

আবেদন

৬৫ বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত গ্রামবাংলার সমসাময়িক অভাব ও সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে নিয়োজিত কিংবদন্তী শিক্ষাবিদ্ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর স্বপ্ন–সন্তান এই **'সমাজশিক্ষা'** পত্রিকাটি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নিজেকে যথাযথ রূপান্তর করে এখনো প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বেদান্তের মুক্তির বাণী কীভাবে দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও চরিত্র গঠনে হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে—ঠাকুর–মা–স্বামীজীর বাণী, বৈদিক ও তপোভূমি ভারতবর্ষের আলোকে সে কথাই পত্রিকাটি বারবার বলে থাকে। **'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'**—স্বামীজী এই বজ্র নির্ঘোষকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তেরা কী সুন্দরভাবে এই সঙ্ঘে একত্র কাজ করছে—সে সকল কথা জানতে ও এই আন্দোলনের শরিক হতে আসুন আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। **সমাজশিক্ষার** সঙ্গে যুক্ত হউন, মানুষের সার্বিক কল্যাণে মুক্তহস্ত হউন।

অনুদান (Donation)

সমাজশিক্ষা সাধারণ অনুদান *(Samajsiksha General Donation)*

৫০০ টাকা এবং তার উপরে পত্রিকার প্রকাশের মাসিক খরচ হিসাবে।

পৃষ্ঠা অনুদান *(Page Donor)*

অনুগ্রহপূর্বক এক বা একাধিক পৃষ্ঠার দায়িত্ব নিয়ে আপনার বা আপনার প্রিয়জনের নামে করুন।

একটি সংখ্যায় এক পৃষ্ঠার দায়িত্ব–অনুদান = ১০০০ টাকা

(Sponsorship for one page in one issue : Rs. 1000/-)

সমাজশিক্ষা পার্মানেন্ট ফাণ্ড *(E.P.F.S.P.)*

(Endowment Permanent Fund for Samajsiksha Patrika)

পত্রিকাটিকে একটি পোক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি দেবার জন্য ৫,০০০ টাকা বা ততোধিক অনুদান দিন।

[Cheque/Draft must be drawn in favour of 'Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur']
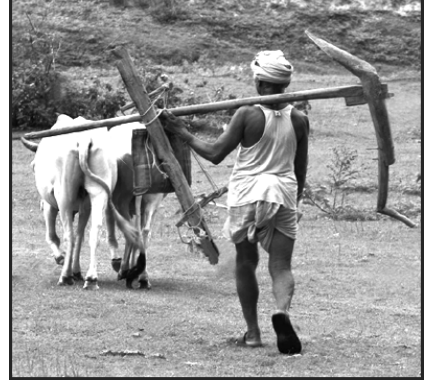
আমাদের mission… চাষাভুষোর জন্য

'আমাদের mission হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভুষোরা ভালবাসা দেখে ভিজবে। … ''উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'' (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)—সকল বিষয়েই এই সত্য। … ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে। … চাষাভুষো মৃতপ্রায়; এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র! তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক, দেখুক এবং করুক।'

—*স্বামী বিবেকানন্দ*

('আমার ভারত অমর ভারত', রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ১৯৮৮, পৃঃ ১৮ থেকে সংকলিত।)

বিবরণী

পরিষদ-প্রশিক্ষণ

২০২১ সালে এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত যে–কজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

ক্রমিক নং	কোর্স	পুরুষ	মহিলা	তপসিল জাতি	তপসিল উপজাতি	অন্যান্য সম্প্রদায়	সাধারণ	মোট
১	মোটর সাইকেল ও অটো রিক্সা রিপেয়ার ও মেইনটেন্যান্স	৪৭	০	২৫	১	৩	১৮	৪৭
২	মোটর মেকানিজম (চার চাকা)	৪৭	০	২৪	১	৬	১৬	৪৭
৩	রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং	১০২	০	৪৫	০	১১	৪৬	১০২
৪	কমার্শিয়াল আর্ট এন্ড ক্র্যাফট্	৪	৮	৪	০	১	৭	১২
৫	অ্যাডভান্স বিউটিশিয়ান	০	১১	৩	০	১	৭	১১
৬	বিউটিশিয়ান, তত্ত্ব ও কনে সাজানো	০	২০০	৬৪	৩	১৬	১১৭	২০০
৭	কম্পিউটার বেসিক	৩৫	৬৪	৪২	১	১২	৪৪	৯৯
৮	ডেস্ক টপ পাব্লিশিং (ডি.টি.পি.)	৯	৭	২	০	১	১৩	১৬
৯	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং	৫১	১	২৪	৩	৮	১৭	৫২
১০	ইলেকট্রিক ওয়্যারম্যান	২৬	০	১০	০	৩	১৩	২৬
১১	ফুড প্রিজার্ভেশন এন্ড ফুড প্রসেসিং	৫	৪	২	০	১	৬	৯
১২	মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং	৪৬	০	১৭	১	৮	২০	৪৬
১৩	ফোটোগ্রাফি (ডিজিটাল ও অ্যানালগ)	২৫	৪	১১	০	৬	১২	২৯
১৪	ফিজিওথেরাপি ইকুইপমেন্ট অপারেটর কাম এ্যাসিস্টান্ট	৪৬	৩৯	২৭	০	১১	৪৭	৮৫
১৫	টিভি রিপেয়ার ও বেসিক ইলেকট্রনিক্স	৪৩	০	১৮	০	১	২৪	৪৩
১৬	কমিউনিকেটিভ ইংলিশ	৩১	৬১	২৬	১	১১	৫৪	৯২
১৭	কাটিং, টেলারিং ও ড্রেস ডিজাইনিং	০	৩৮	১৫	৫	২	১৬	৩৮
১৮	অ্যাডভান্স কাটিং, টেলারিং অ্যান্ড ড্রেস ডিজাইনিং	১	২৪৯	৬৪	৫২	২৩	১১১	২৫০
১৯	যোগাসন	৬	১৮	১০	০	৪	১০	২৪
	মোট	**৫২৪**	**৭০৪**	**৪৩৩**	**৬৮**	**১২৯**	**৫৯৮**	**১২২৮**

আমাদের কথা

গ্রামোন্নয়ন কোন্ ভাবে ও কী পথে !

স্বামীজী বলেছেন, 'এসো মানুষ হও'। মানুষ না হলে কখনোই সভ্যতার বিস্তার, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। কারণ মনুষ্যত্বই ধারণ করে মানবসভ্যতার মূল স্তম্ভগুলিকে। এই স্তম্ভগুলির মধ্যে প্রধান ও অপরিহার্য বিষয়টি হলো গ্রামীণ উন্নয়ন।

গ্রামের মধ্যেই যেকোনো জাতির সার্বিক উন্নতির মর্মবাণীটি নিহিত। তাই প্রয়োজন সুস্থ সবল চরিত্রবান অকপট গ্রামকর্মীর। গ্রামের উন্নতির আর একটি অন্যতম শর্ত হলো কৃষি বিপ্লব। আর বিপ্লব তখনই সম্ভব যখন মানুষ আন্তরিকভাবে কোনো বিষয় গ্রহণ করে সেই বিষয়টিকেই প্রাপ্তির জন্য তন, ধন, মন নিবেদন করে। হাজার হাজার নিষ্ঠাবান গ্রামকর্মী যখন নিজের থেকে এগিয়ে এসে কৃষিসেবার কাজে নিজেদেরকে নিয়োগ করবে, তখনই শুরু হবে আসল কৃষি বিপ্লব তথা সবুজ বিপ্লবের সার্থকতা। কৃষকদের উপযুক্ত সংগঠন ছাড়া উন্নয়নমূলক কৃষিসেবার কথা অধরাই থেকে যায়। উপযুক্ত গ্রামকর্মিরা যথাযথ মানুষ হলেই সংগঠনের ব্যাপ্তি, বিশালতা ও বিস্তার সম্ভব।

গ্রামোন্নয়ন কেবলমাত্র জমির ব্যাপ্তি এবং বিস্তার ঘটিয়ে হয় না। জমি দখলের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে কৃষিক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি করে। তাই মনে রাখতে হবে, জমির পুনর্বণ্টন কৃষির উন্নয়নের বা গ্রাম উন্নয়নের একটি ধাপ। এটিই সব নয়। কৃষি বিপ্লবে সবুজ বিপ্লব কথাটি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। মনে রাখতে হবে, সবুজ বিপ্লব হলো কৃষি-প্রযুক্তিবিদ্ তথা কৃষিবিজ্ঞানীদের অবদান। কৃষকদের সহযোগিতা ছাড়া এই বিজ্ঞানের দানকেও যথাযথ ব্যবহার ও কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

কৃষি বিপ্লব কথাটি কিন্তু আরো ব্যাপক। এর অর্থ কৃষির নতুন নতুন প্রযুক্তিকে কৃষিক্ষেত্র তথা জমির ফসল ফলানোতে কাজে লাগানো। অপরদিকে কৃষকদের মধ্যে এমন কৃষিকর্মী তথা কৃষিসেবক গড়ে তোলা, যারা সংগঠন ও বিজ্ঞানের দানকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বদ্ধ পরিকর। এখনও পর্যন্ত বড় অর্থাৎ সম্পদশালী ও ধনী চাষীরা বিজ্ঞানের দানকে অর্থাৎ সবুজ বিপ্লবের সুবিধাকে কাজে লাগাতে পেরেছে, অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ ছোট ছোট চাষীভাইরা যাদের পরিবার পিছু জমির পরিমাণ এক একরের কম, এরা কিছুতেই সবুজ বিপ্লবের যথাযথ প্রয়োগ করে উপকৃত হতে পারছে না। এদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে ছোট ছোট ও বিক্ষিপ্ত জমিগুলিকে একত্রে চাষ করা যায় কি না, সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া। একত্রে চাষ বলতে চাষের বিভিন্ন পর্যায়ের যেসব কাজ আছে, যেমন—১) কী ধরনের চাষ হবে, ২) কীভাবে সেচ দেওয়া যাবে, ৩) কখন ঔষধ দিতে হবে, ৪) সেচের জন্য বিদ্যুৎ কীভাবে আনা যাবে, ৫) উর্বর ফসলের জন্য কী কী সার প্রয়োগ করতে হবে, এবং ৬) এ কাজের জন্য যে টাকার দরকার সেটি কীভাবে সংগ্রহ করা যাবে।

এই উপরোক্ত কাজগুলি একত্রে পরিকল্পনা করে কাজে নামার জন্য ছোট ছোট চাষীভাইরা নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা আহূত করবে।

আলোচনা সভায় স্থির সিদ্ধান্ত হওয়ার পরই নিজেরাই নিজেদের উদ্যোগে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে কার্যকরী করবার উদ্যোগ নেবে। তাহলেই সঠিকভাবে কৃষি বা গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে।

গ্রামকর্মী বা গ্রামসেবকরা যদি নৈতিকভাবে চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সমস্তটাই ঘোগের মতো পিছন দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'নোঙর ফেলে দাঁড় টানলে, ফল লাভ হয় না।' তাই সমৃদ্ধি জাগতিকভাবে হলেও মানসিক দৈন্যতা সেটিকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

গ্রামোন্নয়নের আর একটি মাধ্যম হলো হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্প। কৃষিশিল্প, কৃষি নির্ভর শিল্প, গ্রামশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্পের জোয়ার আনবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করতে হবে।

ক্ষুদ্রশিল্পের কথা আসতেই সর্বপ্রথম মনে পড়ে খাদি, হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প, কয়ার বোর্ড প্রভৃতি।

খুব কম মূলধনে গ্রামীণ শিল্প প্রস্ফুটিত করা যায়। ঘরে ঘরে অর্থাৎ গ্রামীণ প্রত্যেকটি পরিবার নিজেই নিজের শিল্প গড়ে তুলুক, আর এই শিল্প চাকুরির অপেক্ষা করে না, এ নিজেই অন্যের চাকুরি সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যেই আছে সকল বেকার সমস্যার সমাধান।

বর্তমানে মোবাইল ও ইন্টারনেটের যুগে কত রকমের চাকুরির দরজা খুলে গেছে, তা বলে বোঝানো যায় না। আত্মবিশ্বাস এবং নিজের বোঝার ওপরে নির্ভর করে প্রত্যেকটি গ্রামীণ যুবক-যুবতী এগিয়ে যাক তাদের নিজেদের লক্ষ্যে। তবে নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে কেবল digital সমৃদ্ধির দিকে নজর দিলে, মনুষ্যজীবন মরুভূমিতে পরিণত হয়। নিজের উন্নয়ন-এর একটি বড় মাপকাঠি যে চরিত্র গঠন ও চারিত্রিক উন্নয়ন, সে কথাও মনে রাখতে হবে।

কৃষিকথার আসর

এসো নিজে নিজে চাষ করি।।২

স্বামী নির্বিকল্পানন্দ

সার প্রসঙ্গ

সার শব্দটির অর্থ—শ্রেষ্ঠ অথবা উৎকৃষ্ট অংশ। এই শব্দের বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন—সর্ব ধর্মের সার; বৃক্ষাদির শক্ত মজ্জা; দুধের সার, সর বা ননী; পুরুষের সার তার তেজ, পৌরুষ; কবিতার অথবা কোনো প্রবন্ধের সার—তার গূঢ় তাৎপর্য, মর্মার্থ বা বলা চলে সংক্ষিপ্ত নিষ্কর্ষ। ঠিক সেই রূপ জমির সার বলতে বোঝায়—যে কোনও জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকারী পদার্থ।

মৃৎ-রসায়ন শাস্ত্রে (Soil Chemistry) একটি বহুল প্রচলিত শব্দ রয়েছে Soil Health বা মৃৎ-স্বাস্থ্য। তা চাষ জমিতে যা কিছুই ফসল ফলানো হোক না কেন—ধান, গম, আলু, শাক-সবজি অথবা ফল-ফুল, এমনকী টবে বা গ্রো-ব্যাগে—মাটিতে সার-এর মাত্রা অনিবার্য। ফুল, ফল অথবা আনাজ গাছে দুই প্রকার সারের প্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। জৈব সার (Organic) ও রাসায়নিক (Inorganic) সার। আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, জৈব সার কাজ দেয় অনেক দিন ধরে (Slow Release) এবং গাছ রোপণ বা বীজ বপনের পূর্বে মাটি প্রস্তুতিতে জৈব সার ব্যবহার করা নিতান্তই অনিবার্য।

আমরা প্রায়শই একটা মৌলিক ভুল করে থাকি—Fertilizer ও Manure। এই দুটি শব্দকে সমার্থক শব্দ ভেবে নিই। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। Fertilizer অর্থাৎ রাসায়নিক উর্বরতা যা কি না মাটিতে মূলত নাইট্রোজেন, ফসফোরাস ও পটাশিয়াম জোগান দিয়ে থাকে। (NPK = Nitrogen, Phosphorus & Potassium) আর Manure মাটিকে প্রদান করে এই তিনটি বস্তু ব্যতীত হিউমাস (Humus) অর্থাৎ কি না মাটিতে জল ধরে রাখার ক্ষমতা।

গাছ মাটি খায় না—খায় মাটিতে উপস্থিত খাদ্য পদার্থ। আর গাছের সাধারণ জীবজন্তুর ন্যায় দাঁত তো আর থাকে না—যে কামড়ে কামড়ে তার খাদ্য সংগ্রহ করবে। গাছের শিকড়ে প্রচুর মাত্রায় এক ধরনের রোম থাকে যা কি না মাটিতে থাকা NPK ও অন্যান্য অণুখাদ্য Osmosis ক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকে। তাই মাটিতে জলের উপস্থিতি থাকা একান্ত অনিবার্য। মাটিতে জৈব সারের অভাবে মাটিতে প্রায়শই ফাটল দেখা যায়। কিন্তু উপযুক্ত মাত্রায় মাটিতে জৈব সার থাকলে এটি হয় না। মাটিতে জৈব সার ব্যবহার না করলে ফুল/ফল ফোটানো সম্ভব হলেও উঁচু দরের ফুল ফোটানো অসম্ভব এবং গাছ বেশি দিন যাবৎ ধরে রাখাও যাবে না। আবার মাটিতে অনুপাত অনুযায়ী NPK না থাকলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। California University-র Dr Eric Brodford sustainable Agri-Horticulture বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপক। তিনি বলছেন—'Neither inorganic nor organic, but integrated approach.' অর্থাৎ শুধু মাত্র জৈব নয় আর কেবল রাসায়নিক চাষ নয়—অবিভাজ্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

তার মানে অজৈব সার (অল্প মাত্রায়) ও জৈব সার (সিংহ মাত্রায়) মিশ্রিত সারমাটিতে চারাগাছ লাগানোর পরে, বাড়তি সার হিসাবে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। রাসায়নিক সারের ব্যবহারে বহুল অভিযোগ রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় হলো—ফুলের/ফলের সঠিক রঙ আসে না। শীঘ্র ঝরে পড়ে পাপড়ি। এবং টবের ক্ষতিও (নোনা ধরা) পরিলক্ষিত হয়। আবার মজার কথা হলো—ক্ষেত্র বিশেষে টবে ফল ফেটে যায় ও ফুল ঝরে পড়ে। সে ক্ষেত্রে খুবই অল্প পরিমাণে রাসায়নিক সার/অণুখাদ্য ব্যবহার করে সেই অসুবিধার হাত হতে অতি সহজেই রেহাই পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে আমরা আলোচনা করব—জৈব সারকেই কেমনভাবে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে, যাতে কি না গাছের সেই সব অভাব সরাসরি রাসায়নিক সার/অণুখাদ্য ব্যতিরেকেই পূরণ করা যেতে পারে।
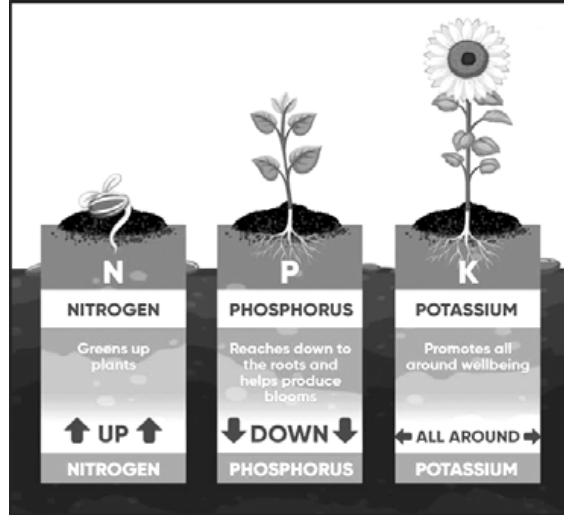
জৈব সার বলতে আমরা বুঝে থাকি মূলত গোবর সার, পাতাপচা সার, হাড়গুঁড়ো, শিং-কুচি ও সরষের খোল। এগুলিই সুষম সার বলা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে নাইট্রোজেন প্রধান হলেও অপর তত্ত্বগুলিও পাওয়া যায়। এছাড়া পুরাতন মুরগির সারও বেশ সমাদ্রিত উদ্ভিদ প্রেমিকদের নিকট। সবুজ সার (Green Manure)-এর ব্যবহার করেও অতীব উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গেছে। এই শ্রেণির মধ্যে ধনচে

(বর্ষা কালে) ও এবোলা পুরো বছর ধরেই চাষ করে তা কম্পোস্ট বিনের মধ্যে দিয়ে অথবা সরাসরি কেয়ারি/টবে ব্যবহার করা যায়।

ইদানীং কালে পাতার সারের জনপ্রিয়তাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাতার সার (Folar feeding) বহুবর্ষজীবী (Perennial) গাছ ছাড়াও কিছু কিছু মরশুমী ফুল/ফলের গাছে ব্যবহার করা চলে—যেমন ডালিয়া, গোলাপ ইত্যাদি।

রাসায়নিক সার ঃ রাসায়নিক সার খুব ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয়। নচেৎ এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতিরই আশঙ্কা অধিক। তবে নির্দিষ্টভাবে কেউ বলতে পারবে না যে, এ সারের ঠিক কতটা মাত্রা হওয়া চাই। কারণ তা মাটির সংগঠন (Soil Structure), মাটির স্বাস্থ্য (Soil Health) ও অনেকটা জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। সে ক্ষেত্রে বলা বাহুল্য, রাসায়নিক সারের বিভিন্ন অবয়বের জ্ঞান অর্জন করে, অল্প মাত্রায় তা প্রয়োগ করে, নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে মাত্রা নির্ধারিত করাই শ্রেয়। এখানে অতি দীর্ঘভাবে আলোচনা করা হলো বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক সারের বিষয়ে।

নাইট্রোজেন সার ঃ ইউরিয়া—নাইট্রোজেন সরবরাহের প্রধান সার। এটি গাছের পাতা পর্যাপ্ত মাত্রায় উৎপাদনে প্রধান সহায়ককারী। পাতার ক্লোরোফিল উৎপাদনের ফলে গাছের সবুজ ভাব জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এই সার বেশি মাত্রায় পড়ে গেলে গাছের vegetation growth-ই বৃদ্ধি পায়। Genetic growth অর্থাৎ ফল/ফুল আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পটাশ সার ঃ পটাশিয়াম সার গাছের কোষ বিভাজনের প্রধান সহায়ক অবয়ব। এই সারের উপস্থিতিতে গাছ মাটি থেকে অণুখাদ্য সহজে গ্রহণ করতে পারে। গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। গাছের সার্বিক বৃদ্ধিতে বিশেষ প্রয়োজনকারী সার এটি।

ফসফোরাস ঃ এই সারের প্রধান কাজ হলো—গাছের শিকড়-এর বৃদ্ধি ঘটানো। প্রায়শই দেখা যায়, কারণে-অকারণে গাছ নেতিয়ে পড়ছে—তার মূল কারণ হলো ফসফোরাসের অভাব। এতদ্ব্যতীত ফুল, ফলে বা বীজের গুণমান বৃদ্ধি করাও ফসফোরাস সারের অন্যতম এক কাজ।

Management of R B F (Root, Branch & Flower/Fruit) (শিকড়, কাণ্ড ও ফুল/ফলের প্রবন্ধন)

ফুল বা ফল গাছের সার্বিক উন্নয়ন-এর জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, প্রথমেই গাছের শিকড়-এর। শিকড় যদি যথেষ্ট বিকশিত ও পুষ্ট না হয়, আর গাছকে নিয়মিত খাবার দিয়ে যাওয়া যায়, সেই খাদ্য গাছটি রাখবে কোথায়? তাই প্রথমেই আমাদের গাছের শিকড়ের সুষ্ঠু বৃদ্ধির দায়িত্ব নিতে হবে। মাটিতে যদি চাহিদা মতো ফসফোরাস না থাকে, গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে অর্থাৎ শিকড় পুষ্ট হবে না। শিকড়ের সঞ্চিত খাদ্য দ্বারা কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি পাবে ও ক্রমে ফুল বা ফল সুন্দরভাবে বিকশিত হবে।

তাই মাটিকে গাছের 'মা' বলা হয়। মা যদি স্বাস্থ্যবতী হন, সন্তানরা স্বাভাবিকভাবে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। আর মা যদি রুগ্‌ণা, দুর্বল হন, সন্তানও সেই রূপ হয়ে থাকে। মাটিতে শুধু রাসায়নিক সার দেওয়া মানে সন্তানকে খাওয়ানো। গাছকে খাবার জোগানো। কিন্তু জৈব সার দিলে গাছের জননী, অর্থাৎ মাটি স্বাস্থ্যবতী হবে আর স্বাভাবিকভাবে গাছও সুস্থ হবে।

যদি আমরা এর বিহঙ্গম দৃষ্টিতে সার তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে ব্যাপারটি খুব সহজ হয়ে যাবে আমাদের নিকট।
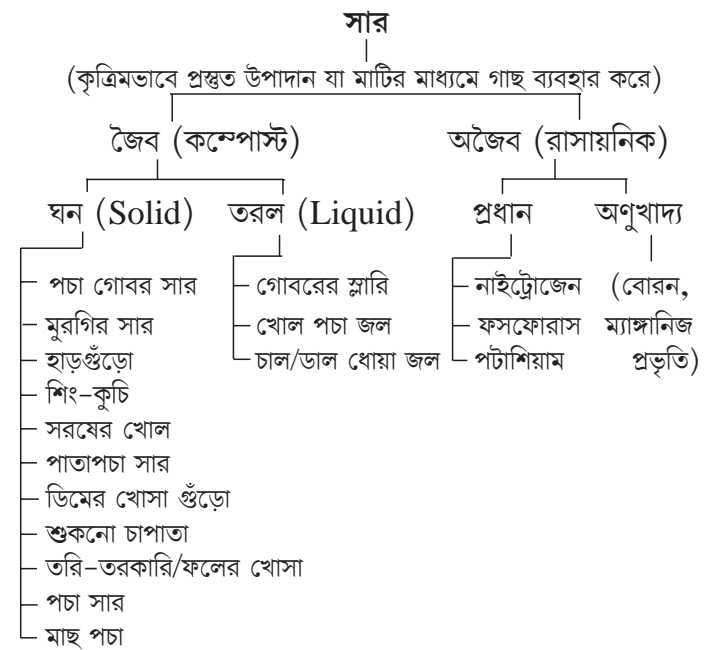
তরল জৈব সার (Liquid manure)

তরল সারের ব্যবহার ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। খোল পচা জল ও কাঁচা গোবর জলের ব্যবহারের বিষয় আমরা সকলেই অবগত রয়েছি। তবে এ ছাড়াও তরল কেঁচো সার (Wormi-wash), পায়রার বীট জলে ভিজিয়ে, তার খুব পাতলা জল, সবজির/ফলের খোসা জলে ৭/১০ দিন পচিয়ে—তার তরল জল, এমনকী চাল ধোয়া জল—মাটির পুষ্টি বৃদ্ধি করে থাকে। এমনকী গোরুর চোনা—খুব পাতলা করে গাছের বাড়ন্ত অবস্থায় দিলে বেশ উপকার হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, তরল সার ঘন অবস্থাতে কোনোমতে দেওয়া যাবে না। তাতে গাছের মঙ্গলের বদলে অমঙ্গলই হবে। আর এই তরল সার ছেঁকে ব্যবহার করাই বিধেয়। মাটি অল্প অল্প ভিজা থাকবে, সেই অবস্থায় তরল সার দিতে হবে। খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে যদি টবের/কেয়ারির মাটিকে একটু খুঁচিয়ে নেওয়া যায় এই সার প্রয়োগের পূর্বে। *(চলবে)*

পরিক্রমা

গ্রামোন্নয়নে যৌথ বন পরিচালন বিভাগ

পরিষদ–সংবাদদাতা

স্বামী বিবেকানন্দের সেবা ভাবনা হলো গ্রাম উন্নয়নের এক আদর্শ মডেল আর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ প্রতি নিয়ত এই সেবাকাজে যুক্ত। এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনমুখী কর্ম–পরিকল্পনায় স্ত্রী–পুরুষ, জাতি–উপজাতি, ধনী–গরিব নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া প্রধান উদ্দেশ্য। দেশে–বিদেশে এই উন্নয়ন ভাবনা স্বীকৃত, গ্রামেও গড়ে উঠেছে আস্থা, বিশ্বাস। উপভোক্তারা হাসিমুখে সমাজ–সংস্কৃতির কাজে সামিল হয়ে নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামে পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে পুজো হবে, কর্মযজ্ঞ শুরু হবে। মানুষের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে 'মানুষ হওয়ার' বাসনা তৈরি হবে, এটিই রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য।

সূচনা ঃ রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট–এর তত্ত্বাবধানে ঝাড়গ্রামের বিনপুর–২ ব্লকে গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালে। ঊষর জমিগুলিতে আম–কাজু বাগান করে গ্রামবাসীদের পরিবারের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন সুগঠিত হয়। বৃক্ষশূন্য গ্রামে একরের পর একর পড়ে থাকা পতিত জমিতে সবুজায়নে এগিয়ে এসেছিল গ্রামের প্রায় ১৫টি পরিবার, তাদের মধ্যে বিশেষ ছিলেন শ্রীখোকন টুডু, শ্রীমাধব বেসরা এবং আরও কিছু গ্রামবাসী। তারা খুব কাছে থেকে জঙ্গলকে শেষ হতে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন, অরণ্যের পুনঃনির্মাণ ছাড়া জীবন–জীবিকা দুর্বিষহ। গ্রামে ১৫টি পরিবারের ১৫ একর ঊষর জমি সবুজ হয়েছে। গ্রামবাসীদের জ্বালানীর সমস্যা মিটেছে। বাড়ি তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতের কাছে, আয় বেড়েছে, আম ও কাজু থেকে প্রতি বছর পরিবার পিছু ১২ হাজার টাকা আয় হয় (২০২০ সালের হিসাব)। এছাড়া

কাজু বাগান পরিচর্যা

যাঁরা আরও একটু নিবিড়ভাবে বাগান চাষের কথা ভেবেছেন তাঁরা অন্তর্বর্তিকালীন ফসল—যেমন ওল, হলুদ গাছের চারা তৈরি করে আরও আয় করেছেন (বছরে অন্তত ১০ হাজার টাকা)।

'গ্রীষ্মকালের দাবদাহ থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি দিয়েছে এই ফল বাগান' বললেন গ্রামের এক বাগানকর্মী ময়না সোরেন। শুধু তাই নয়, অরণ্যাঞ্চলের পাখির সংখ্যা বেড়েছে, বনজ পশু—যেমন শিয়াল, বুনোশূকর, ময়ূর, সাপ ও অন্যান্য সরীসৃপ প্রাণীর সংখ্যাও বেড়েছে। এই সবই হলো প্রকৃতির সম্পদ আর এই সম্পদকে পুনরুজ্জীবিত করতে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ সদা তৎপর।

গ্রীন কলেজ–এর ভূমিকা ঃ লোকশিক্ষা পরিষদের কর্মযজ্ঞ এক জায়গায় থেমে থাকেনি কখনো। পরবর্তী প্রজন্ম এই লোকশিক্ষা পরিষদের সাথে একইভাবে যুক্ত হয়ে স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসর হবে। এই উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত গ্রীন কলেজের থেকে তাঁরা কারিগরি

শালপাতা ট্রেনিং পরিক্রমা

প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, কাজ শিখেছেন, চর্চা করেছেন, নিজের ও পরিবারের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। স্বনির্ভরভাবে আয়ের লক্ষ্যে লোকশিক্ষা পরিষদ থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী ১০,০০০ টাকা করে অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। তাঁরা সেই অর্থে শালপাতা সেলাই মেশিন কিনেছেন। প্লেট বানানোর যন্ত্র কিনেছেন এবং অর্থ উপার্জন করছেন। এছাড়াও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তিমে সফল শিক্ষার্থিদের সাহায্য করা হয়। গ্রীন কলেজের তিনটি উপকেন্দ্র রয়েছে, যথা—

(১) সাঁতুড়ী গ্রীন কলেজ, (২) মটগোদা গ্রীন কলেজ ও (৩) অযোধ্যা গ্রীন কলেজ।

শিশুশিক্ষা–বিস্তার ঃ শিশুশিক্ষা বিস্তারে লোকশিক্ষা পরিষদের ভূমিকা অতুলনীয়। প্রত্যন্ত জঙ্গলমহল অঞ্চলে শিশুদের বই পড়া, খেলাধুলা, স্বাস্থ্যচর্চার অভ্যাস গড়ে তুলতে গ্রীন কলেজের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। টুরুবাঁধের আদিবাসী গ্রামে শিশুদের শিক্ষার জন্য গড়ে উঠেছে 'মা সারদা শিশুশিক্ষা কেন্দ্র'। প্রত্যেক শিশুকে 'বাদনা পরব' উপলক্ষ্যে জামাকাপড় দেওয়া হবে, তাই ছোট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের শিশুদের পুজোর জামাকাপড় বিতরণ করা হয়।
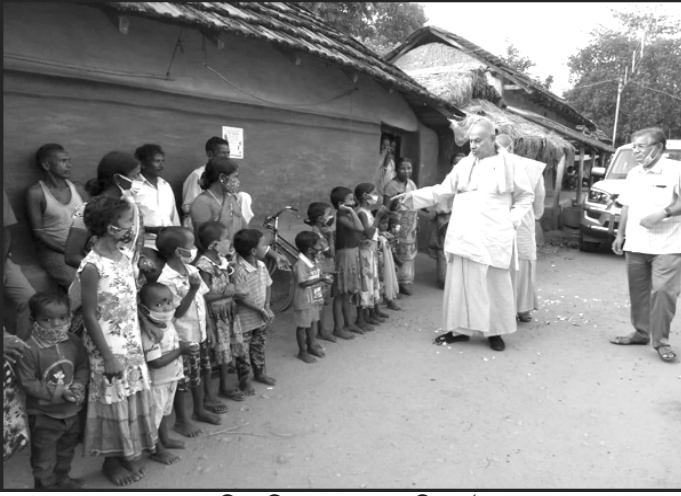
শিশুশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন

গ্রীন কলেজের অন্তর্গত প্রায় ৮টি শিশুশিক্ষা বিদ্যালয় রয়েছে—যেগুলিতে প্রতি বছর পুজোয় শিশুদের কিছু দেওয়া হয়।

পরিষদের গ্রীন কলেজ কর্মযজ্ঞ পরিক্রমা ঃ ২৯ অক্টোবর ২০২১, দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর–২নং ব্লকের বৃন্দাবনপুর আদিবাসী গ্রামের উন্নয়ন পরিদর্শন করতে যান নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ এবং বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষবৃন্দ। সেখানে সম্পাদক মহারাজ গ্রামের উন্নয়নের উপর কিছু বক্তব্য পেশ করেন। সভাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫ জন শিক্ষার্থীর হাতে শালপাতার দ্রব্য তৈরি করার মেশিন তুলে দেন এবং বলেন 'কাজ করে যাও, পরিবার ও পরিবেশের কল্যাণে কখনো কাজ ছেড়ে থেকো না।' গ্রামের প্রায় ৫০টি পরিবার এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রত্যেকের চোখে মুখে প্রশান্তি, ভালো লাগা, ভালোবাসা আর নিজেকে উপার্জনমুখী করে তোলার প্রয়াস তাদের কথাবার্তায়, চাল–চলনে ফুটে উঠছিল।

তারপর টুরুবাঁধের 'মা সারদা শিশুশিক্ষা কেন্দ্র'–এ মহারাজ যান। সেখানকার মহিলারা পূজনীয় সম্পাদক মহারাজকে চন্দনের ফোঁটা ও ফুলমালা পরিয়ে স্বাগত জানান। মহারাজ প্রত্যেক শিশুর হাতে জামা–প্যান্ট তুলে দেন ও পারিবারিক কাজকর্মের সাথে সাথে শিশুশিক্ষার কাজে সমবেত হওয়ার পরামর্শ দেন। মটগোদা গ্রীন কলেজের সাথে যোগাযোগ নিবিড় করতে বলেন।

কৃষ্ণানন্দ FPO–এর উদ্বোধন ঃ ৩০ অক্টোবর ২০২১ তারিখে সকালের অনুষ্ঠান ছিল পুরুলিয়া জেলার হুড়া ব্লকের কল্যাণ পরিচালিত কৃষ্ণানন্দ ক্লাস্টারে। গ্রীন কলেজ, লোকশিক্ষা পরিষদ, কল্যাণ ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র–এর সহায়তায় 'কৃষ্ণানন্দ FPO'–র শুভ উদ্বোধন হয়। এছাড়া উদ্বোধন হলো কৃষি পরিষেবা কেন্দ্র ও গ্রামীণ যুবক–যুবতীদের পশুপালন প্রশিক্ষণ। উদ্বোধক ও সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সর্বলোকানন্দ এবং বিশেষ অতিথিদের আসনে ছিলেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রদানন্দ। গ্রামের মানুষেরা ঠাকুরের গান পরিবেশনের

FPO অফিসের শুভ উদ্বোধন

মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার ন্যাবার্ড অফিস থেকে শ্রীচিরাগ রাহা, প্রাণী সম্পদ বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর (পুরুলিয়া জেলা) ডঃ শুভানন্দ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কৃষ্ণানন্দ ক্লাস্টারের সেবাকার্য চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন ও ক্লাস্টারের পরিষেবা অটুট রাখতে সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস সেন। সভাপতির বক্তব্যে স্বামী সর্বলোকানন্দ বলেন ঠাকুরের নামে এই প্রত্যন্ত গ্রামে সেবাকার্য শুরু হয়েছে বলে তিনি আনন্দিত।

অর্জুনজোড়া ভূতনাথ গ্রাম উন্নয়ন ঃ এটি পুরুলিয়ার একটি ক্লাব যারা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় অর্জুনজোড়া গ্রামে আরো নিবিড়ভাবে চাষবাস, পশুপালন, বৃক্ষরোপণ, এছাড়াও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহারাজ তাদের দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করেন এবং ক্লাবের কাজকর্মের খবরাখবর নেন। তাদেরকে কৃষ্ণানন্দ ক্লাস্টার থেকে পরিষেবা গ্রহণ করতে বলেন।

এরপর মহারাজ ও কর্তৃপক্ষবৃন্দ কল্যাণ-এর সহযোগী সংগঠন পরিদর্শন করেন। সদস্যদের কাছে ক্লাবের কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর ক্লাবের মেরামত করতে বলেন।

বিকেলে অযোধ্যা গ্রীন কলেজ আরণ্যক কেন্দ্রে পৌঁছান। সেখানে আবাসিক ছাত্রদের সাথে পশুপালন-এর প্রশিক্ষণের বিষয়ে কথা বলেন এবং কেন্দ্রে সেলাই শিক্ষার প্রশিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দেন। গ্রীন কলেজ কর্মিদের সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ চালানোর ব্যবস্থা করতে বলেন।

সাঁতুড়ী গ্রীন কলেজ পরিদর্শন ঃ ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে সকালে গ্রীন কলেজ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুই জন সফল ব্যবসায়ী (প্রদীপ কৈবর্ত্য, বাদল ব্যানার্জী)-দের সাথে মহারাজ দেখা করেন। প্রায় ২১ জন সফল শিক্ষার্থী ব্যবসা শুরু করার জন্য ১০,০০০ টাকা করে মূলধন পেয়েছেন। মহারাজ তাদের সাথে ব্যবসা এবং গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি চাষ নিয়ে কথা বলেন ও পরামর্শ দেন। সাঁতুড়ী গ্রীন কলেজে চলতে থাকা টেলারিং ট্রেনিং এবং পশুপালন শিক্ষার শিক্ষার্থিদের সাথে সম্পাদক মহারাজ কথা বলেন ও তাদের উৎসাহ দেন স্বনির্ভর হওয়ার জন্য। এছাড়াও তিনি বক্তব্য রাখেন যে, গ্রীন কলেজ তথা রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের কর্তৃপক্ষ ও কর্মিরা গ্রাম-বাসীদের উন্নয়নের জন্য সর্বদা সাথে আছেন এবং থাকবেন।

(৭০৭ পৃষ্ঠায় 'জল-সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠবণ্টন !-এর শেষাংশ)

বছরে গড়ে এগারোশো সত্তর মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। এর মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের চেরাপুঞ্জি যেমন রয়েছে, যেখানে বছরে এগারো হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, তেমনি রয়েছে পশ্চিমে জয়সলমির, সারা বছর মিলিয়ে দুইশো মিলিমিটারও সেখানে বৃষ্টি হয় না। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ বৃষ্টি হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে, একশো কুড়ি দিনে। উত্তর-পূর্ব ভারতে যেখানে বছরে দেড়শো দিন বৃষ্টি হয়, সেখানে গুজরাট, রাজস্থানের মরু অঞ্চলে সাকুল্যে পাঁচ দিনও বৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের জায়গাগুলির মধ্যে একটি আমাদের দেশের চেরাপুঞ্জি কিন্তু সেখানেও তীব্র জল সংকটের মধ্যে রয়েছে মানুষ। চেরাপুঞ্জিতেও খরা হয়। জল সংরক্ষণের সমস্যা অন্যতম কারণ। প্রচুর বৃষ্টি হলেও সমস্ত জলই বেরিয়ে যায় চেরাপুঞ্জি থেকে। জমা হয় বাংলাদেশে। সেখানকার মানুষ বন্যার কবলে পড়ে। তীব্র জলাভাবে রয়েছে ওড়িশার কালাহান্ডি, বোলাঙ্গির ও বরাগড়। মূল কারণ মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা কম।

খরা অঞ্চলে জল সংকট

আমাদের ভারতবর্ষ নদীবহুল দেশ। হিমালয়ের উৎস থেকে বরফ গলা জলে পুষ্ট নদীগুলি সারা বছর জলের জোগান দেয়। বৃষ্টিধৌত নদীগুলি শিরা উপশিরার মতো সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আর আছে জলাভূমি, জলাশয়, খাল, বিল, পুকুর, ঝিল, বাঁওড় ও ভূগর্ভস্থ জল ভাণ্ডার। তার সাথে যুক্ত হয়েছে দুইটি মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ। ভূপৃষ্ঠের জলের প্রধান উৎস হলো বৃষ্টিপাত। বৃষ্টির জল ভূপাতিত হয়ে বেশির ভাগই নদী, নালাবাহিত হয়ে সমুদ্রের নোনা জলে গিয়ে মেশে। কিছুটা বাষ্প হয়ে উবে যায়। খাল, পুকুর ভরে যাওয়ার পর অবশিষ্টাংশ মাটিতে শোষিত হয়ে ভূগর্ভে চলে যায়।

যদিও জল পরিষেবার বেসরকারিকরণের ভয়াবহ পরিণতি এর মধ্যেই প্রমাণিত। এক লিটার দুধের দামে কিনতে হচ্ছে এক লিটার বোতলবন্দী জল। এমতাবস্থায় জল ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সাধারণ মানুষের অধিকার এই আওয়াজ তুলতে হবে। এই মুহূর্তে ভাববার সময় এসেছে। প্রথমেই প্রয়োজন জল সংরক্ষণ। বৃষ্টির জল ধরে রাখা জরুরি। জলাধার নির্মাণ করা, নতুন খাল, পুকুর খনন ও সংস্কার করা। 'জল ধরো, জল ভরো' শুধু শ্লোগানে সীমাবদ্ধ না রেখে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার জন্য। সবার আগে বন্ধ করতে হবে জলের অপচয়। দেশের সমস্ত মানুষ যাতে সমান পরিমাণে ও স্থায়ীভাবে জল সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পান, তা সুনিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। চাষী এবং গরিব মানুষের উপযোগী করেই গড়ে তুলতে হবে জলের পরিকাঠামো ও পরিষেবা।

তথ্যসূত্র ঃ (১) বেতার প্রচারিত জল বিষয়ক প্রতিবেদন ও সমীক্ষা। (২) প্রকৃতি পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের সেমিনার ও আলোচনা। *(সময় জুন ২০১১)*

বিবেক-দৃষ্টি

বিবেক আলোকে গ্রামোন্নয়ন ।।১০

শিবশঙ্কর চক্রবর্তী*

পূর্ব সংখ্যায় বর্ণিত প্রকল্পগুলি হচ্ছে মিশনের দ্বারা গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়াসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত মূল নীতির উপর ভিত্তি করে রামকৃষ্ণ মিশন গত ১০০ বৎসর যাবৎ তাদের নানা প্রকল্প সংগঠিত করে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, এর যদি সঠিক এবং সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে, মিশন একটা 'উন্নয়নের বিকল্প ধারা'কে অনুসরণ করছেন; যার মধ্যে প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে স্বনির্ভরতা অর্জন, স্থানীয় প্রযুক্তি এবং কৌশলের প্রয়োগ যা অনেক বেশি স্থায়ী এবং পরিবেশবান্ধব হয়। এরা ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংহতির বিকাশ ঘটিয়েছে প্রাদেশিক সম্প্রদায়ের সাথে জাতীয় স্তরের মেলবন্ধনের মাধ্যমে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হয়েছে, কারণ, সমস্ত প্রকল্পগুলিই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে পরিচালিত হয়েছে। আমরা আশা করব, মিশনের এই গ্রামীণ উন্নয়নের কর্মধারা নিরন্তর ঘটে চলবে এবং সারা দেশের সব প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য এক নবসাজে সজ্জিত উপায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

সেবাই জীবন ধারণের পথ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্মের চারটি প্রধান মাত্রা বা দিক আছে। ধর্ম শুধু মাত্র কয়েকটি আচার-আচরণ বা মতবাদ নয়, পরন্তু নিজের জীবনে সত্যকে উপলব্ধি করা। দ্বিতীয়ত, ধর্মের পথ ততটাই বিজ্ঞানভিত্তিক যতটা আমরা যে-কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বুঝি। প্রধান অন্তর হলো প্রথমটি মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির উন্মোচন ঘটানোর চেষ্টা করে, যাতে করে সত্যর উপলব্ধি হয় আর পরেরটি (অর্থাৎ আমাদের জ্ঞাত বিজ্ঞান) বহির্বিশ্বের সত্যকে খোঁজ করে থাকে। কিন্তু এখন এটা উপলব্ধি করা গেছে যে, দুটো ধারাই একই দিকে মিলিত হচ্ছে। তৃতীয়ত, সমস্ত ধর্মই একই সত্যকে উপলব্ধি করার প্রতি নির্দেশ করে, তাই তার দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শত্রুতা বা কলহের কোনো অবকাশ থাকে না। শেষত, যেহেতু সবার মধ্যেই সেই একই আত্মা বিরাজমান, এমনকী সব প্রাণী এবং উদ্ভিদকুলের মধ্যেও এবং মানুষই ভগবানের সব চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রকাশ, তাই মানুষের নিঃস্বার্থ সেবাই ভগবানের সেবা। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে তাঁর বক্তৃতাতে ধর্মের এই বিষয়েই আলোচনা করেছিলেন।

স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মূল বিষয় ঠিক করা হয় 'সেবাই জীবন ধারণের পথ (Service as way of life)'। এই ক্ষুদ্র পরিসরে আমি, এই ধারণার ও ভাবনার দৈনন্দিন জীবনে কার্যকরী উপযোগের আলোচনা করব। ব্যক্তির এবং সমষ্টির উভয়েরই ক্ষেত্রে। এর দার্শনিক দিক নিয়ে আরও অনেক জ্ঞানী পণ্ডিতেরা—যাঁরা এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন তাঁরা আলোচনা করবেন। প্রথমত এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবার ভাব ও ধারণা এবং আমাদের জীবনে তার প্রয়োগ তখনই অর্থকরী হবে, যখন প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিকতার সঠিক অনুশীলন সাথে সাথে চলবে। কিয়দংশ ধর্মীয় সাধনা ব্যতিরেকে সত্যিকারের নিঃস্বার্থ সেবা প্রায় অসম্ভব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এক খুবই নিকট শিষ্য শম্ভু মল্লিকের সমাজসেবার খুবই আগ্রহ ছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি মানুষের সাহায্য করার জন্য প্রায় অন্ধের ন্যায় আবিষ্ট ছিলেন। ওনার এই আবিষ্টভাব দেখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, যদি ওনার সাথে ঈশ্বরের দেখা হয়, তবে উনি কি তার কাছে এই সাহায্যই চাইবেন যাতে করে বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করা যায়, না কি আত্মোপলব্ধির প্রার্থনা করবেন যা সমস্ত ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ, যখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কাছে 'নির্বিকল্প সমাধি' চাইলেন, তিনি স্বামীজীকে তিরস্কার করে বললেন যে, তিনি চান যে স্বামীজী যেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশ্রয় দিতে পারেন; আর কিনা ও চাইছে নিজের মুক্তি। আপাত দৃষ্টিতে উপরের দুটি ঘটনা বিপ্রতীপ মনে হলেও, একদমই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মতো করে বুঝলে বোঝা যাবে যে, এখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই; কারণ নিঃস্বার্থ সেবা তখনই সম্ভব যদি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করেই সমগ্র কাজ করা হয়

* *'Rural Development'—শিবশঙ্কর চক্রবর্তী-রচিত পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করেছেন স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।*

এবং যার প্রভাব সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। এই পন্থা অনুসরণ করে যদি নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করা যায়, তবে তারা শুধু বাস্তবিকভাবেই উপকৃত হবে না, তারা নিজেরাও তাদের ভিতরের শক্তিকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের সেবার মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাকে প্রকাশিত করা যায়। আমাদের শাস্ত্রানুসারে ঃ

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্	শ্রদ্ধার সঙ্গে দাও
অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্	অশ্রদ্ধার সঙ্গে দিও না
শ্রিয়া দেয়ম্	তোমার ক্ষমতা অনুযায়ী দাও
হ্রিয়া দেয়ম্	মিত্রের মতো দাও
ভিয়া দেয়ম্	অত্যন্ত যত্ন সহকারে দাও
সংবিদা দেয়ম্	বিনয়ের সাথে দাও

স্বামীজীর মতে, আমরা যখন সেবাকার্য করব তখন আমরা যেন খুব বিনীত থাকি এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আমাদের এই সুযোগ দেবার জন্য। একমাত্র এই ভাবেই মানুষের সত্যিকারের উন্নয়ন করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে একটি ঘটনা, যেটি স্বামী আত্মস্থানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন বলেছিলেন, অনেক বছর আগে উনি রামকৃষ্ণ মিশন, রাজকোট কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। একবার ঐ স্থানে ভীষণ খরা হয় এবং মিশনের হয়ে রাজকোট কেন্দ্র সেখানে ব্যাপক ত্রাণকার্য করেন। যখন ত্রাণের দল একটি গ্রামে পৌঁছায় তাঁরা প্রথমে সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন কোনো কাজ না করে কারুর থেকে সাহায্য নেওয়াটা ঠিক নয় এবং উচিতও নয়। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর তাঁরা রাজী হন। কয়েক মাস পরে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রামবাসীরা তাঁদের ফসল উৎপাদনে সক্ষম হন। একদিন বিকালে স্বামী আত্মস্থানন্দজী যখন ওনার অফিস ঘরে বসেছিলেন, দেখলেন যে, অনেকগুলো গরুর গাড়ি বস্তাভর্তি খাদ্যশস্য নিয়ে আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করছে। উনি ওনাদের কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁরা এই খাদ্যশস্য কেন নিয়ে এসেছেন? এর উত্তরে ওনারা বললেন যে, গতবার খরার সময় মিশন তাঁদের সাহায্য করেছিলেন—তাই এবার যখন ঠিকঠাক ফসল উৎপাদন হয়েছে, মিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা-স্বরূপ তাঁরা মিশনকে এই শস্য দিতে এসেছেন। আমরা যদি এই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করি, তবে বুঝতে পারব যে সত্যিকারের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কী অসীম প্রভাব পড়ে তাঁদের উপর, যাঁদের এই সেবা প্রদান করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে, সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব আবার জাগ্রত করা। দুর্ভাগ্যপূর্ণভাবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেবাকার্য নিজের বাড়-বাড়ন্তর জন্যই করা হয় মানুষের সত্যিকারের সাহায্য গৌণ হয়ে পড়ে।

নিঃস্বার্থ সেবার আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো সত্যিকারের সুসংহত উন্নয়নের প্রসার। দুর্ভাগ্যপূর্ণভাবে, যতই আমরা সুসংহত উন্নয়নের কথা বলি, ততই সমাজের সর্বত্রই বিভেদ প্রকট হয়ে উঠছে। কার্যত, আমাদের মধ্যে একাত্মভাবের অভাব এবং মানুষ আর বিশ্বসংসারের একাত্মতা অনুভবের অভাবেই আমরা এই চঞ্চলচিত্ত, অস্থিরমতি হয়ে অশান্তিতে আছি। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু অন্যান্য মানবকুলের সঙ্গে নয়, এমনকী তৃণ, কীট পতঙ্গাদির সাথেও একাত্মতা অনুভব করতেন। ঘাসের উপর দিয়ে চলে বেড়াতেই উনি কষ্ট পেতেন। আজকের দিনের পরিবেশের এই অধোগতির সময়ে এটা আরও বেশি করে উপলব্ধি করা যায় যে, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে উন্নয়নের কত প্রয়োজনীয়তা। আমাদের নিজেদের জীবনের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন না করে আমরা শুধুই বাস্তু এবং পরিবেশের পুনরুদ্ধারের কথা বলে যাই। আমরা যদি আমাদের লোভ এবং আগ্রাসী মনোভাব ত্যাগ না করতে পারি, তবে আমরা কখনোই পরিবেশ রক্ষা করতে পারব না। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে উদ্ভুত উদ্বাস্তুদের সমস্যা সম্বন্ধে আমরা অবহিত কিন্তু আমাদের তথাকথিত শিক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য যারা বাস্তুহারা হয়েছে তাদের ব্যাপারে আমরা নির্লিপ্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে কারণ আমাদের উন্নয়নের প্রয়াসের পেছনে কোনো সুসংহত দর্শন নেই বলে।

জাতীয় জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সমিতির (National Water and Sanitation Committee) সভ্য হিসাবে সাম্প্রতিককালে আমি অনেকগুলো রাজ্যে যাই সেখানকার জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা দেখার জন্য। এই দলের সদস্যরা রাজস্থানের চুরু জেলায় যান। এই চুরু জেলা শুধু খরাপ্রবণই নয়, এর ভূগর্ভস্থ জল খুবই লবণাক্ত। এই ভূগর্ভস্থ লবণাক্ত জলের সমস্যার থেকে মুক্তি পাবার জন্য রাজস্থান সরকার ভারত সরকারের সহায়তায় ৬৭টি নির্লবণীকরণ প্রকল্প, যার এক একটির মূল্য ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা, চালু করে। এই এক একটি প্রকল্পের চালু রাখার ব্যয় প্রায় ২ লক্ষ টাকা এবং এর জন্য খুবই উন্নত কারিগরী বিদ্যাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন। আমরা যখন এগুলো প্রদর্শন করতে যাই, তখন দেখা যায় ৬৭টির মধ্যে ৬৫টিই বিকল হয়ে আছে—কারণ রাজস্থান সরকার এর চালু রাখার খরচ যোগাতে পারছে না। আমরা যখন চিফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে জানতে চাইলাম যে, তবে শত শত বৎসর ধরে মানুষরা এই প্রকল্প ছাড়াই কিভাবে বেঁচে ছিল? তিনি এর কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। পরে আমরা যখন গ্রামগুলি ঘুরে দেখতে লাগলাম, তখন আমাদের নজরে এলো গ্রামের মানুষদের আঙ্গিনাতে মন্দিরের মতো অনেকগুলো নির্মাণ। একই গ্রামে এতগুলো মন্দিরের মতো নির্মাণ

দেখে আমাদের কৌতূহল হলো আর আমরা তাদের কাছ থেকে এর সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। তারা বললেন যে, এগুলো প্রচলিত পদ্ধতিতে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য (Rain Water Harvesting) তৈরি করা আর বৎসরের ৮ থেকে ৯ মাস এখান থেকে তারা পানীয় জল পেয়ে থাকেন। এই সমস্ত দেশীয় প্রযুক্তির উন্নতি এবং প্রসার না ঘটিয়ে আমাদের প্রযুক্তিবিদরা অতি উন্নত প্রযুক্তি আনার ফলে তা স্থায়ীত্ব লাভ করেনি। এই সব নির্লবণীকরণ প্রকল্প চালু করার জন্য শুধু যে কর প্রদেয় ব্যক্তির এত অর্থ ব্যয় হয়েছে তাই নয়, স্থানীয় মানুষজনের অনেক প্রত্যাশা তৈরি হবার ফলে তাদের চিরাচরিত জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থাগুলি অবহেলিত হয়ে পড়ে। উন্নয়নের নামে এই ধরনের বিচ্যুতি শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্যত্রও ঘটে চলেছে—যার ফল হয়েছে বিপরীত ধর্মী। এই ধরনের প্রয়াস চালু করা হয় কারণ আমাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে হঠকারী মনোভাব এবং স্থানীয় মানুষদের সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং জীবন ধারার সম্বন্ধে কোনো সম্যক জ্ঞানের অভাব। আর এইভাবে মানুষের সঠিক সেবা কখনোই সম্ভব নয়।

আমরা জানি যে, স্বামীজীর বিশ্বপরিক্রমা তাঁর ভারত পরিক্রমারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্বামীজী হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পদব্রজে শুধু এই দেশের তীর্থস্থানই ভ্রমণ করেননি, দেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির রূপ দর্শন এবং অনুধাবনও করেছিলেন। তিনি গরিবের কুটির থেকে শুরু করে ধনীর অট্টালিকাতেও দিন যাপন করেছিলেন। স্বামীজী শুধু নিজেই এটা করেননি, তার সন্ন্যাসী ভাইদেরও একই কাজ করতে অনুরোধ করেছিলেন। যখন স্বামী অখণ্ডানন্দ ক্ষেত্রীতে ছিলেন স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, 'ক্ষেত্রী নগরের প্রতিটি গরিব এবং নিম্ন বর্ণের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ধর্মের সাথে সাথে মৌখিকভাবে ভূগোল ইত্যাদির শিক্ষাও দিতে হবে।' আমরা কিন্তু প্রায়শই বড় বড় শহরের অফিসে বসে যোজনা তৈরি করি আর মানুষকে তা অনুসরণ করতে বলি।

দরিদ্র বৃদ্ধার যথাসাধ্য সাহায্যের অঙ্গীকার

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার দ্বারা চালিত সমাজসেবার আর একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, আমাদের মধ্যে এই আত্ম-প্রত্যয় থাকতে হবে যে, মানুষ আপাত গরিব হতে পারে কিন্তু সবারই কিছু না কিছু দেবার ক্ষমতা আছে। আমরা ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক-এর দিকে যাই না বরংচ এক অবস্থান থেকে তার উচ্চতর অবস্থানে গমন করি। আমরা সাধারণত সর্বদা ভাবি যে, গরিবরা কিছুই দিতে পারে না। এটা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমি একটি ঘটনা বলতে পারি। রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর একটি ভবন বানানোর প্রকল্পের জন্য প্রথমে এক লক্ষ টাকা দেন। এই টাকা অপ্রতুল বলে তারা আবার মিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে আরও সাহায্যের জন্য। অর্থের অভাবের জন্য আর সাহায্য করা সম্ভব ছিল না, তাই তারা গ্রামবাসীদের প্রস্তাব দেয় সেই টাকা নিজেরাই যাতে জোগাড় করতে পারে তার ব্যবস্থা করার। গ্রামবাসীরা ইতস্তত করে এবং জানায় এটা হয়তো তারা নিজেরা জোগাড় করতে পারবে না। তখন কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে মিশনের কর্মীকে পাঠানোর কথা বলেন। এইবার এই যৌথ দল সেই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যায় এবং প্রত্যেকের খুবই ক্ষুদ্র দানেও প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। মিশনের সেই কর্মী একটি বাড়ি থেকে অর্থ সংগ্রহের সময় একটি খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা লক্ষ্য করেন। কোনও এক রবিবার ঐ দলটি একটি মুসলমান বিধবার বাড়িতে যান, যার দুটি সন্তান আছে এবং যে নিজে ঐ গ্রামে কৃষি-শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। ঐ দলটি যখন দুপুর ১১টা নাগাদ ঐ বাড়িতে যান এবং অর্থ সাহায্য চান, তখন ঐ মহিলা জানান, তার কাছে সামান্য কিছু চাল ছাড়া আর কিছু নেই আর ঐ চাল দিয়ে তাদের দুপুরের আহার হবে। যখন কর্মীরা বুঝতে পারল যে এখানে কিছু সাহায্য চাওয়া সঠিক হবে না এবং চলে আসছিল, তখন ঐ মহিলা তাদের ডেকে ঐ চালটুকু সবই তাদের দেবার জন্য উদ্যোগী হন। যখন সবাই তাকে বলেন যে, ঐ চাল দিয়ে দিলে তিনিই বা কি খাবেন আর তার সন্তানদের কি খাওয়াবেন? তার উত্তরে তিনি বলেন, এটা একটা ধর্মীয় কারণে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে আর তিনি কোনো যোগদান দিতে পারবেন না—তার সেটা ভালো লাগছে না। আর তা ছাড়া তাদের অনেকদিনই অনেক কারণে অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকতে হয়। তাই এই মহৎ কাজের জন্য না হয় আর একদিন খাবার ছাড়াই দিন কাটাবেন। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, আমাদের মানুষের মন কত উদার এবং তারা তাদের কর্মে ও মননে কতটাই ধার্মিক। আমরা যদি সত্যিকারের সেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের কাছে যাই, তবে এই ধরনের বিমোচন প্রায়ই দর্শিত হবে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই দেশের 'দারিদ্র দূরীকরণ'

প্রকল্পের সাথে পরিচিত আছেন। প্রকৃতপক্ষে এই আর্থিক বৎসরে ভারত সরকার গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ৭১০০ কোটি টাকার যোজনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু গত দশক ধরে এই প্রচুর নিবেশ সত্ত্বেও আমরা আজ পর্যন্ত দারিদ্র দূর করে উঠতে পারিনি। বাস্তবিক দিক থেকে দেখলে এই 'দারিদ্র দূরীকরণ' অনেক সমাজসেবীর কাছে একটা বড় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি বহু সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রতি টাকাতে শতকরা ৯০ ভাগই বেহাত হয়ে গেছে আর মাত্র শতকরা ১০ ভাগই সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এই ধরনের বিচ্যুতির কারণ আমাদের বেশির ভাগেরই ঐ সব মানুষের জন্য কোনো সত্যিকারের উদ্বেগ/দরদ নেই। এক পক্ষকাল আগে ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের যুগ্ম-সম্পাদক মীনাক্ষী সুন্দরম আমাদের প্রকল্পগুলি ঘুরে দেখেন আর এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে জানতে চান যে আমাদের উন্নয়নের ধারাটি কি? এর উত্তরে আমি বলি আমাদের কোনো বাঁধাধরা গদ নেই। আমাদের কাজের খসড়া তৈরি হয় সঠিক কৃষি-পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, জীবন যাত্রার মান ও মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে। আমরা এটাও দেখতে চাই যে, মানুষ নিজে কী করে তার নিজের উন্নয়নের জন্য সাহায্য ও যোগদান করতে পারে। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, একবার যদি মানুষের বিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা যায় তবে তারাই নিজেদের ক্ষমতার পরিমাণ করতে পারে এবং নিজেরাই নব নব ভাবনা নিয়ে এবং সম্পদ—তা নগদ বা বস্তু হতে পারে, যোগদান করে।

জামতারা-তে সুসংহত আদিবাসী বিকাশ প্রকল্প

রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর আশ্রম একটি নূতন প্রকল্প চালু করেছেন যার নাম 'ব্যাঙ্কিং দি আনব্যাঙ্কেবল (Banking the Unbankable)'-এর মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয় জোগাড় করা হয় ১ লক্ষ আমানতকারীদের থেকে, যার পরিমাণ ২ কোটি টাকা এবং যা পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলার ৬০০টি ক্ষুদ্র স্ব-পরিচালিত সংস্থার মাধ্যমে। এই একই উপায় অবলম্বন করে মিশন ভারতের সর্ববৃহৎ স্বচ্ছতা প্রকল্প চালু করে এবং যার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলাতে ৫৫,০০০ অল্প ব্যয়ে নির্মিত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করা হয়েছে কোনো সরকারি বা অন্য কোনো ভর্তুকি ছাড়াই। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজসেবার দর্শনের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়ঃ (১) সামাজিক সংহতি, (২) জন সাধারণের অংশগ্রহণ, (৩) গভীর সম্পর্কের স্থাপন এবং (৪) জনগণকে সংগঠিত করা। *(চলবে)*

(৭১৫ পৃষ্ঠায় 'শিকাগোর এক ব্যবহারিক সন্দেশ'-এর শেষাংশ)

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী আবহমান কালের সনাতন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এই প্রবহমান ধারার মধ্যে যেমন অতীত ও বর্তমান (স্বামীজীর সমসাময়িক কাল) পড়ে, তেমনি ভবিষ্যৎ কালও নিঃসন্দেহে সেই ধারার অন্তর্গত। স্বামীজীর স্বপ্নের ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি আমরা, আমাদের পূর্বজ-রা তাঁদের জীবনে 'Universal acceptance' দেখিয়ে গেছেন। এখন আত্মসমীক্ষার সময় এসেছে, আমরা নিজজীবনে তা কতটা করছি? 'Universal acceptance'-এর ব্যবহারিক প্রয়োগের একটা সূত্র (tips) পেতে পারি শ্রীশ্রীমায়ের একটি বাণীতে, 'কারুর দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের'। আমাদের মধ্যে দোষদর্শন যত কমবে আত্মীয়তা তত বাড়বে, বাড়বে সকলকে আপনার বোধ—'Universal acceptance'। অবশ্যই এ সাধনও চেষ্টাসাপেক্ষ।

আমাদের ব্যক্তিগত, পরিবার ও সমাজজীবনে দেখতে পাই, যে ব্যক্তি অপরের দোষত্রুটি-সহ তাকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়, পরিবার ও সমাজজীবনে সে সাধারণের চেয়ে উচ্চ আসন লাভ করে থাকে। অবশ্য দোষসহ অপরকে বরণ করে নেওয়া সহজ কাজ নয়। এই ভাবটির ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য নিজ সঞ্চিত অর্থ, সময়, শ্রম, আরাম, এমনকী নিজের অভিমান পর্যন্ত ত্যাগ করা আবশ্যক। আদর্শে দৃঢ়নিষ্ঠ হলে এই ত্যাগ সম্ভব। আদর্শ বাস্তবায়নে বাধাবিপত্তি অবশ্যম্ভাবী। তবে ধৈর্যসহ অধ্যবসায়ে এই বাধা অতিক্রম সম্ভব। সম্ভব অদোষদর্শন ও হৃষ্টচিত্তে সকলকে আপন বলে গ্রহণ। আমরা নিজজীবনে যতটা প্রয়োগ করতে পারি, ততটাই আমরা স্বামীজীর বাণীকে সফল করব। আমাদের সকলের উপর স্বামীজীর অনেক আশা, সনাতন ভারতবর্ষের বর্তমান প্রতিনিধি আমরা নিজজীবনে 'Universal acceptance'-এর বাণীকে প্রয়োগ করে স্বামীজীর শিকাগো সভার গৌরবগাথাকে যেন আজও অম্লান রাখতে পারি। নচেৎ শিকাগো বক্তৃতার স্মরণ ও উদ্‌যাপন নিছক আনুষ্ঠানিকতা।

জনজীবন

কৃষিফসলে শ্রীরামকৃষ্ণ

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

কথামুখ ঃ ভক্ত কবি রামপ্রসাদ গেয়েছেন, 'মন রে কৃষি কাজ জান না।/এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।' যাই হোক, এ যেন কবির ব্যক্তিগত খেদোক্তি নয়, এ সর্বকালের সর্বমানবের মনকে কৃষিকাজে অক্ষম বলে দোষারোপ করা। কারণ বিষয়াসক্ত মন কাম-কাঞ্চনের মায়ামোহে কৃষিজমি চাষ দিলেও, মানবজমিন আবাদহীন পতিতই ফেলে রাখে। গুরুদত্ত বীজ তাতে রোপণ করে না, ভক্তিবারি সিঞ্চন করে না। তাই কাঙ্ক্ষিত সোনার ফসলও ফলে না। এ সোনার ফসল হলো মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছানো—যা ঈশ্বরদর্শন বা মা ভবতারিণীর কৃপা-উপলব্ধি।

এই মানবজমিনে সোনা ফলিয়ে দেখিয়ে গেলেন রামপ্রসাদ। আর এযুগে আবার সোনা ফলিয়ে জগতের মানুষকে দেখালেন যুগাবতার, সেই 'সোনার মানুষ' শ্রীরামকৃষ্ণ। নরদেহে অবতীর্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। কথায় কথায় তাঁর ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ। উপমার সম্রাট তিনি। উপমা ও গল্পের অবতারণায় ভাগবত কথা সহজ ও প্রাঞ্জল করে ভক্তদের কাছে উপস্থাপনা করতেন। জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিসঞ্জাত কী সে উপমার চমৎকারিত্ব! উপমা শ্রীরামকৃষ্ণস্য! গ্রামবাংলার কৃষিভিত্তিক জনজীবন থেকে বিভিন্ন ফসল, ফল ও ফুলের উপমা যেমন প্রয়োগ করেছেন, তেমনি লোকাচার, পুরাণ-শাস্ত্র থেকেও উপমা সংগ্রহে খামতি নেই। নিজে চাষবাস করেননি ঠিকই, কিন্তু কৃষিকার্য বিষয়ে তাঁর নিখুঁত জ্ঞান ও ধারণা এই উপমা নির্ধারণের পারঙ্গমতায় সবিশেষ পরিস্ফুট। এককথায় বলতে গেলে তিনি 'কৃষি কোবিদ'। হবেন নাই বা কেন—তিনি যে অনন্তভাবময়। তাঁর জ্ঞানের অন্ত কে করে? বেদ-বেদান্তও তাঁর জ্ঞানের কাছে চুপ মেরে যায়।

এ প্রবন্ধের শিরোনাম অনুসারে আমরা তাঁর শ্রীমুখে উচ্চারিত কৃষিজ ফসল, ফল, ফুল, শাকসবজির কথা নিয়ে একটু আলোচনায় প্রয়াসী হবো। এ আমাদের গঙ্গাজলে যেন গঙ্গাপূজা!

ধান ঃ প্রথমে বলি, বাংলার প্রধান কৃষিজ ফসল ধানের কথা। ধান্যই লক্ষ্মী। ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা বঙ্গদেশের গ্রামবাংলার মাটি। মণি বা মাস্টারমশায়কে ঠাকুর ভক্তিপথের উপযোগিতা নিয়ে বলছেন ঃ 'বল, আর (বিচার) করবে না? মণি ঃ আজ্ঞা না। ঠাকুর বলছেন ঃ ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

'তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ও-দেশে ধান মাপে, যেই রাশ ফুরোয় অমনি একজন রাশ ঠেলে দেয়! মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।'[১]

ধানের গাদায় মাপ বা একপ্রকার বিশেষ মাপের ঝুড়ি দিয়ে পরিমাণটা মেপে দেখা হয়। তখন একজন মাপে ও আরেকজন পেছন থেকে ধান জড় করে সামনে এগিয়ে দেয়।

এই উপমাটি ব্রহ্মময়ী মা যেমন পেছনে বা অলক্ষ্যে থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে দিচ্ছেন সন্তানের অফুরন্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে। ঠাকুরের কথামৃত-বরিষণেই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আবার বিধিবাদীয় ভক্তি ও প্রেমাভক্তি বা রাগভক্তির প্রভেদ বোঝাতে আনছেন ধানকাটা মাঠ পার হওয়ার কথা। যেমন ধান হলে মাঠ পার হতে গেলে আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। রাগভক্তি প্রেমাভক্তি ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালোবাসা এলে আর কোনো বিধিনিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা একদিক দিয়ে গেলেই হলো।[২]

আম ঃ এবার আমের কথায় আসা যাক। আমের জন্মস্থান আমাদের এই ভারতবর্ষ। আমে আছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ও খনিজ পদার্থ। এছাড়া ভিটামিন-এ, বি কমপ্লেক্স ও সি। খনার বচনে বলেছে, 'আম ডাকে ধান, তেঁতুল ডাকে বান।' যে বছর আম ভালো ফলে, সে বছর ধানের ফলনও ভালো হয়। যাই হোক, ফলের রাজা আম। বিশেষ করে মালদহের বহু বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন জাতের আমের মিষ্টতার তো জগৎজোড়া খ্যাতি। ঠাকুর বলছেন ঃ **আম খেয়ে**

১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত (অখণ্ড), ২০১৩, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ৩৭২।

২) তদেব, পৃঃ৩০৬

মুখ পোঁছার কথা। ভালো মিষ্টি আমের ক্ষেত্রে অন্য কেউ ভাগ বসায় এটি অনেকেরই অভিপ্রেত নয়। বিশেষ করে, আম্ররসিক বালকের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কিন্তু গ্রামবাংলার এই সহজলভ্য অভিজ্ঞতাটি ঠাকুর ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে কোন উচ্চতায়

নিয়ে গেছেন, খতিয়ে দেখলে অবাক হতে হয়। 'পরমহংস—নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী এঁরা আপ্তসারা—নিজের হলেই হলো।

'ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হল, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি করছে। ...

'কেউ আম লুকিয়ে খেয়ে মুখ পুঁছে! কেউ অন্য লোককে দিয়ে খায়—লোকশিক্ষার জন্য আর তাঁকে আস্বাদন করবার জন্য। চিনি খেতে ভালোবাসি।'[৩]

কখনো আবার 'আম'-এর প্রসঙ্গ এসেছে পরমপ্রাপ্তি বা চৈতন্যলাভের কথায়। সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক আছে কি না কিংবা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য এতো বর্ণনা করা নিয়ে ঠাকুর বলছেন ঃ অত হিসাব কেন? আম খাও, কত আমগাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটি পাতা, এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।

'চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে তাহলে ও-সব হাবজা-গোবজা বিষয় জানতে ইচ্ছাও হয় না।'[৪]

যাই হোক, 'জাতীয় ফল' নিয়ে এতো সুন্দর উপমা প্রয়োগ 'মানিক রাজার আম্রকাননে খেলা করা' 'বিরাট শিশু'র পক্ষেই সম্ভব! নিশ্চয়ই তিনি হিমসাগর, বোম্বাই, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, সফদরপসন্দ, পেয়ারাফুলি, রানিপসন্দ, চৌসা, দশেরি, আম্রপালি প্রভৃতি আম খেয়েছেন।

আনারস ঃ গ্রামবাংলার আরেক রসালো ফল বা ফলের গুচ্ছ আনারস। ঠাকুরের শ্রীমুখে আনারসও এসেছে কথায় কথায় উপমা প্রসঙ্গে। পাকা টুসটুসে আনারস কিংবা আনারসের জুস, আনারসের চাটনি বাঙালির খুবই প্রিয়। কিন্তু

আনারসের পাতায় কাঁটা ভর্তি থাকে। অবশ্য পাতা কেটে হলুদের সঙ্গে বেটে রসও অনেকে খায়, কৃমির উপদ্রব তাতে কমে। আনারসের কাঁটাবন ছাড়িয়ে ফলটি পেতে হয়। ঠাকুর বলছেন ঃ দেখ, তাঁকে কেউ খোঁজে না। আনারসগাছের ফল ছেড়ে লোকে তার পাতা খায়।[৫]

আমড়া ঃ 'আম' যেমন উপাদেয় মিষ্টিমধুর ফল, তেমনি টক ফল 'আমড়া'ও প্রকৃতির দান। কচি আমড়ার চাটনি কিংবা পাকা আমড়াও খেতে মন্দ লাগে না। কিন্তু ফলটির অন্তঃসারশূন্যতা অর্থাৎ শাঁসাল ভাগ বড় কম। সেটাকে ঠাকুর কাজে লাগিয়েছেন তাঁর ভাগবত প্রসঙ্গে। বলছেন ঃ 'সংসারে

কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না!'[৬] আবার কখনো বলছেন ঃ 'সংসারে সুখ তো দেখছ! যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া। খেলে হয় অম্লশূল।'[৭]

আলু-বেগুন ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া জেলার মাঠে মাঠে আলুর চাষ। গড়বেতা, চন্দ্রকোনা, কামারপুকুর, জয়রামবাটী অঞ্চলে ব্যাপক আলুর চাষ হয়ে থাকে। আর এই আলু রপ্তানি হয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। আলু ছাড়া বর্তমানে আমরা কোনো তরকারির কথা ভাবতেই

৩) তদেব, পৃঃ৫০৫ ৪) তদেব, পৃঃ৮৭৯-৮০ ৫) তদেব, পৃঃ১৪৩ ৬) তদেব, পৃঃ১১৫ ৭) তদেব, পৃঃ৪২৭

পারি না। সেদ্ধ, ভাজা থেকে আরম্ভ করে ঝালে–ঝোলে এর ব্যাপক ব্যবহার। আর বেগুন তো বাঙালির খাদ্যতালিকার একরকম সবজি। স্বভাবতই যুগাবতারের কথামৃতে 'আলু–বেগুন' প্রসঙ্গ এসেছে। বলছেন ঃ 'যতক্ষণ ''আমি'' বোধ তিনি রেখেছেন ততক্ষণ সবই আছে। আর স্বপ্নবৎ বলবার জো নাই। নিচে আগুন জ্বালা আছে, তাই হাঁড়ির ভিতরে ডাল, ভাত, আলু, পটোল সব টগ্‌বগ্ করছে। লাফাচ্ছে, আর যেন বলছে, ''আমি আছি, আমি লাফাচ্ছি।'' শরীরটা যেন হাঁড়ি; মন, বুদ্ধি—জল; ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন—ডাল, ভাত, আলু পটোল। অহং যেন তাদের অভিমান, আমি টগ্‌বগ্

করছি! আর **সচ্চিদানন্দ অগ্নি**।'[৮] ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারকে Free Will ও God Will নিয়ে বোঝাতে গিয়ে বেদান্তের এই উপমা আবার চয়ন করেছেন। 'একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু, বেগুন সব ভাতে দিয়েছ; খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে ''আমি নড়ছি'', ''আমি লাফাচ্ছি''। ... ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান। জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ।'[৯] আবার সমন্বয়ের ধারণা বোঝাতে বলছেন ঃ চাকর বা দাসী বাজারের পয়সা নেওয়ার সময় এটা আলুর, এটা বেগুনের, এগুলো মাছের বলে হিসেব করে লয়ে সব মিশিয়ে দেয়।

ওল ও তার মুখি ঃ গ্রামবাংলায় ওল–কচু চাষও খুব হয়। ওল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। শীতকালে ওলের গাছ শুকিয়ে গেলে মাটি খুঁড়ে ওল বের করা হয়। বর্তমানে মাদ্রাজী ওল সারাবছর বাজারে পাওয়া যায়। এতে গলা কুটকুট্ও কম করে আর আকারে বড় বলে ভেজে কিংবা রেঁধেও খাওয়া যায়। যাই হোক, মাদ্রাজী ওলও এখন পশ্চিমবাংলায় ব্যাপক চাষ হচ্ছে। বড় সাইজের ভালো ওলের মুখিটিও ভালো হয়। ঠাকুর রাখালের বাপকে সন্তুষ্ট করতে ওলের উপমাটির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। বলেছেন ঃ 'আহা, রাখালের স্বভাব
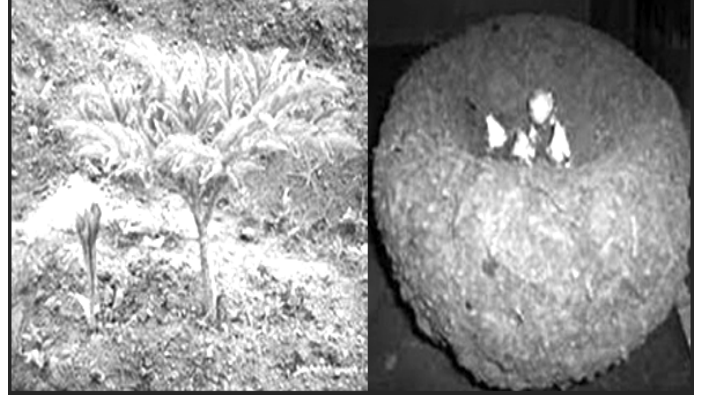
আজকাল কেমন হয়েছে। তা হবে নাই বা কেন? ওল যদি ভাল হয়, তার মুখিটিও ভাল হয়। যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে!'[১০]

নারকেল ঃ বাংলায় নারকেলের শাঁস খুবই উপভোগ্য। নারকেলের পুর, পুলিপিঠে, চিংড়ির মালাইকারি ও নারকেল নাড়ু প্রস্তুত করতে বাঙালির ঘরে এটির খুব আদর। এই

নারকেল ঠাকুরের উপমায় এক অনন্য মহিমায় মহিমান্বিত। বলছেন ঃ 'বিষয়াসক্তি ... চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে নড় নড় করে, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। একে বলে খড়ো নারিকেল।'[১১] ঈশ্বরের কার্য কিছু বোঝা যায় না। বলছেন ঃ 'ডাব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি!—এ–দিকে পানিফল জলে থাকে—গরম গুণ।'[১২]

বেল ঃ কথায় বলে, ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়? অর্থাৎ, ন্যাড়ামাথা ও পাকা বেলের সাদৃশ্য এবং শক্ত ভারী ফলের আকৃতি এ প্রবাদের সৃজন–কল্পনার রসদ। যাই হোক, বেলপাতা যেমন শিবের পূজায় অত্যাবশ্যক, তেমনি পাকা বেলও জীবের কাছে পরম আদরের ফল। বেলে থাকে

৮) তদেব, পৃঃ২১২ ৯) তদেব, পৃঃ৯৬৭ ১০) তদেব, পৃঃ১৫৩ ১১) তদেব, পৃঃ৬৬৩ ১২) তদেব, পৃঃ৬০৩

মিউসিলেজ আর পেকটিন যা কোষ্ঠকাঠিন্যের অব্যর্থ ওষুধ। বেলের শরবত আমাশয় রোগীদের অন্ত্রের যত্ন নেয়। কাঁচা বা আধকাঁচা ফল খিদে ও হজমক্ষমতা বাড়ায়। দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখে বেল কার্যকরী। বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষায়

বেলের পাতা, ফল আর মূলের অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই পর্ণমোচী উদ্ভিদটি বাংলার মাটিতে তাই দেবতাজ্ঞানে পূজিত। মা দুর্গার অপর নাম বিল্ববাসিনী। তাই পূজার আগে বিল্ববরণ অনুষ্ঠান মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায়। যাই হোক, দক্ষিণেশ্বরে বেলতলায় তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ঠাকুর স্বয়ং ঈশ্বরীকে পেয়েছেন। পঞ্চবটীতে বেদান্ত সাধনাও করে সিদ্ধিলাভ হয়েছে তাঁর। তাই কি তাঁর শ্রীমুখে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বোঝাতে বেল ও তার শাঁস এত সহজে উপনীত? বলছেন ঃ 'তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয়—ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ। জীবজগৎসুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বিচি আলাদা করা যায়, আর একজন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখ তো, তুমি কি খোলা বিচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? ... খোলাটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বিচি। ... বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বিচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয়, যে সত্ত্বাতে শাঁস সেই সত্ত্বা দিয়েই বেলের খোলা আর বিচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।'[১৩]

কাঁকুড় ঃ 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি' প্রবাদটি প্রয়োগ করছেন ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের আয়ের চেয়ে দান বেশি এই অর্থে। কিন্তু কাঁকুড়ের চেহারা ও তার লম্বা বিচির চেহারা মনে করলে প্রায়োগিক যাথার্থ্যটুকু

আমাদের মনে প্রস্ফুটিত হয়। 'কাঁকুড়' গ্রামবাংলার চাষীদের একটি অর্থকরী ফসল।

কুমড়ো ঃ 'কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর' প্রবাদটুকু কথায় কথায় তৈরি করছেন। কুমড়ো বা চালকুমড়ো পুজোতে বলি দেওয়া হয়। তাই বাড়ির মেয়েরা কাটতে পারে না। আগে কোনো

পুরুষমানুষ ওটি কেটে দেন। বাঙালি ঘরে কুমড়োর ছক্কা খাওয়ার চল মনে করিয়ে দেয়, এটি কৃষিজমিতে ফলানোর কথা।

লাউ ঃ 'লাউ কুমড়োর আগে ফল' কিংবা 'লাউয়ের ডোল' বড় হলে ভালো তানপুরা হয়—এসব কথা মনে করিয়ে দেয়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রামবাংলার ঘরের চালে কিংবা লাউয়ের মাচায় ঝুলতে থাকা লাউ ও তার ডগা চাষের আটপৌরে ছবি।

অবতার বরিষ্ঠের ভাগবত আলোচনা প্রসঙ্গে কথায় কথায় উপমার ছড়াছড়ি। আর এই উপমা কৃষিক্ষেত্র থেকে ফুল, ফল ও শস্যের। 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছোট ছোট গ্রামগুলি সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা। তার গাছে গাছে কত ফুল-ফলের সমারোহ। আর 'অচিনে গাছ' শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অমৃতফলের থোকা নিয়ে আমাদের জন্য চিরকাল অপেক্ষারত।

১৩) তদেব, পৃঃ৩১৪-১৫

কৃষিকথা

ব্রোকলি চাষে আয়

ব্রোকলি একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সবজি। এটি ফুলকপির মতো দেখতে হলেও বর্ণে সবুজ। আমাদের দেশে এই সবজির চাহিদা বেশ ভালো। এর বর্ণ সবুজ হওয়ায় অনেকেই একে সবুজ ফুলকপি বলে থাকেন। চাইনিজ খাবারে ব্যবহৃত অন্যতম প্রধান উপকরণ এই ব্রোকলি। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন-সি এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে। এর গন্ধটাও আকর্ষণীয়। ব্রোকলি ফুলকপির মতো অত বড় হয় না। নিয়মিত ব্রোকলি খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এর বাজার দর ভালো হওয়ায় চাষীদের মধ্যে ব্রোকলি চাষে আগ্রহ জন্মেছে। সাধারণত জল জমে না এরূপ উঁচু জমি, উর্বর দোঁয়াশ মাটি হলে ফলন ভালো হয়। ব্রোকলি ১৫-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভালো জন্মালেও ব্রোকলি এখন প্রায় সারা বছরই চাষ হয়।
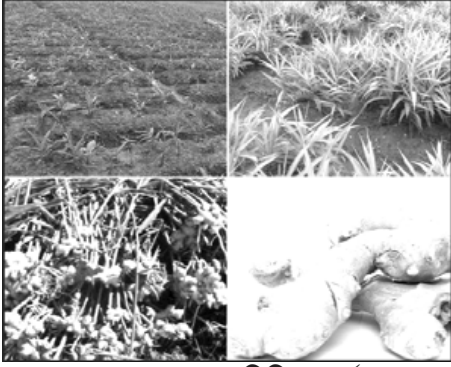
আদার ফলন বাড়ান

আদা চাষের বিভিন্ন পর্ব

আদার চাহিদা থাকে সারা বছরই। বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে আদা চাষ ভালো হয়। আদা চাষের জন্য উপযুক্ত জলনিকাশি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এই চাষে জল খুব অল্পই লাগে। আদা সর্বদাই ছায়াযুক্ত অঞ্চলে চাষ করা হয়। মাটিতে বসানোর আগে আদার কাণ্ড শোধন করে নিতে হয়। সারা বছরই বাজারে চাহিদা থাকায় আদা চাষে ভালো লাভের মুখ দেখেন চাষীরা।

সয়াবিন চাষ

সয়াবিন আমাদের খুবই পরিচিত একটি ফসল। এই চাষের জন্য উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থা থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, বীজগুলি রোপণ করার আগে ভালোভাবে শোধন করে নিতে হবে। এই গাছে যাতে রোগপোকার আক্রমণ না ঘটে তার জন্য সচেতন থাকতে হবে। লিটার প্রতি ০.৭৫ গ্রাম এ্যাসিফেট গুলে প্রয়োগ করলে পাতা ও শুঁটি ছিন্নকারী পোকার আক্রমণ অনেক কমবে। বাজারে এর চাহিদা থাকায়, এটি আজ লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

জীবিকা যখন বনসাই

নানা রঙের বাহারি টবে সাজানো রয়েছে বট, তেঁতুল, পাকুড়, অর্জুন, বাবলা গাছ। নানা ধরনের গাছের তালিকাটি যেমন দীর্ঘ, তেমনই বৈচিত্র্য তাদের গড়নে। বনসাই হলো শক্ত কাণ্ডবিশিষ্ট গাছকে নান্দনিকভাবে খর্বাকৃতি করার শিল্প। তবে সব ধরনের গাছের বনসাই হয় না। যেসব গাছের সহ্য ক্ষমতা বেশি, দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে, এক্ষেত্রে সেই ধরনের গাছকেই মূলত বেছে নেওয়া হয়। বনসাই যত পুরোনো হয়, তা ততই মূল্যবান হয়। আর এখানেই লুকিয়ে থাকে ব্যবসায়িক দিক। বনসাই পরিচর্যার জন্য প্রতি মাসে দুবার করে জলের সঙ্গে তিন-চার দিন ভেজানো সর্ষের খোলের জল ৫০ শতাংশের অনুপাতে মিশিয়ে গোড়ায় দিতে হবে। বর্তমানে অনেকেই বনসাইকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এর চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা যায়।

শসা চাষে আয়

শসা আমাদের কাছে একটি অতি পরিচিত ফল। ঠাকুরের পূজা থেকে মানুষের খাবার পাতে শসা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফল। তাই শসা চাষ করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। দোঁয়াশ বা বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে শসা চাষ খুব ভালো হয়। এই চাষের জন্য প্রথমেই

মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। পরে জৈব সার, ইউরিয়া, পটাশ এবং ফসফেট ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে পরিমাণ মতো। প্রতি বিঘা জমিতে ৪০০–৫০০ গ্রাম বীজ চাষ করা সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে, শসা গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে। এইভাবে সামান্য সতর্কতাই শসা চাষে চাষীকে লাভের মুখ দেখাবে।

চাষ করুন সবুজ ঘাস

অনাবাদি জমি, পুকুরের পাড় বা জমির আল যেখানে কোনো অর্থকরী ফসল করা হয় না, অথচ সেই মাটির উর্বরতা শক্তি ধরে রাখার জন্য সবুজ ঘাসের চাষ করা যেতে পারে। দূর্বা, সুমা, প্যারা, নেপিসার ইত্যাদি সবুজ ঘাস চাষ করা যেতে পারে। এতে জমির উর্বরতা শক্তি অনেক বাড়ে, তাই চাষীরা এই সবুজ ঘাস চাষে বর্তমানে বেশ যত্নবান হয়েছেন।

কম পুঁজিতে চন্দ্রমল্লিকা চাষ

ফুলের চাহিদা বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। চন্দ্রমল্লিকা চাষ করে লক্ষ্মীলাভ সম্ভব। চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বিভিন্ন জাত আছে, যথা—ম্যানিমোন, ইনফাতড়, নমসম, সিঙ্গল, ইন্দিরা, স্পাইডার ইত্যাদি। এই চাষ খুব সাধারণ ও সহজভাবে বাড়িতেই করা যায়। বেশি ফুল পেতে কৃষি বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন। অল্প সময়, কম পরিশ্রমে এবং সামান্য পুঁজিতে এই চাষ করে ভালো আয় করা সম্ভব।

অর্কিড চাষ

অর্কিড আমাদের অনেকের কাছেই খুব পছন্দের ও শখের গাছ। ছায়াঘেরা ঘরে বা খোলামেলা জায়গায় কিংবা গ্রিনহাউসে ঝুপড়ি করেও এই চাষ সম্ভব। গরমে অন্তত ২–৩ বার অর্কিড ঘরে জল দিয়ে এবং শীতকালে সপ্তাহে একবার জল দিয়ে স্যাঁতসেঁতে ভেজা আবহাওয়া তৈরি করতে হয়। এই গাছের জন্য তরল রাসায়নিক সার অর্কিডের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। অর্কিড চাষ করে যেমন শখ মেটানো সম্ভব, ঠিক তেমনই এই চাষে আয় করাও যায় নিশ্চিন্তে। তবে এই চাষে আয় করতে হলে গাছের অনেক বেশি যত্নের প্রয়োজন হয়।

জাফরান চাষে আয় করুন

জাফরান আসলে একটি ফুলের রেণু বিশেষ। এই জাফরান অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ার জন্য এর আর এক নাম লাল সোনা। এই গাছ বিশ্বের যে–কোনো জায়গায় হতে পারে। এই গাছের ফুল থেকে রেণু সরিয়ে নেবার কাজটা খুবই কষ্টসাধ্য। এই কাজের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মাতে পারে এই জাফরান গাছ। তবে এই চাষের জন্য শুকনো মাটিতে শরৎকাল বা বসন্তকালে জমিতে সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই চাষের জন্য ৩৫°–৪০° সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে ১৫° থেকে ২০° সেন্টিগ্রেড–এর কম হলে চলবে না। এই চাষে আর্থিকভাবে চাষীরা লাভবান হওয়ায়, এই চাষের কদর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

কম খরচে শ্বেত সরষে চাষ

চাষীরা কম খরচে শ্বেত সরষের চাষ করতে পারেন। এই সরষের উন্নত জাতগুলি হলো বিনয়, সুবিনয় এবং ঝুমকা। বেলে–দোঁয়াশ মাটিতে এই চাষ ভালো হয়। এই চাষের জন্য একর প্রতি তিন কেজি হারে বীজ ব্যবহার করতে হবে। তবে শ্বেত সরষের বীজ ব্যবহারের আগে তা ভালো করে শোধন করে নিতে হবে। এই বীজ সারিতে বসানোই ভালো। সারিতে যদি এই বীজ বোনা হয় তবে দুই সারির মধ্যে ৩০ সেমি দূরত্ব রাখতে

হবে। শ্বেত সরষের চাষে সেচের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এই চাষে দুবার সেচ দিতে পারলে ভালো হয়। কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এই চাষ করলে আরো ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব।

সুপারির ফলনে লক্ষ্মীলাভ

আমাদের দেশে মূলত সুপারির চাষ হয় কর্ণাটক, কেরল ও আসামে। সুপারির চাষে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। দরকার শুধু উঁচু জলনিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত জমি। গাঙ্গেয় পলিমাটি এই চাষের পক্ষে আদর্শ। পশ্চিমবঙ্গের জন্য সুপারির উন্নত জাতগুলি হলো মঙ্গলা, মোহিতকণা, সুমঙ্গলা ও শ্রীমঙ্গলা। এর মধ্যে মোহিতকণার জাতটি বিশেষ উপযুক্ত। এই জাতটি উচ্চফলনশীল। একটি গাছ থেকে ৪-৫ কেজি সুপারি পাওয়া সম্ভব। উচ্চফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে গাছের বয়স ১০ বছর হলেই সুপারি পাওয়া যেতে পারে।

গোবর সারের বাজিমাৎ

জৈব সারের প্রয়োগে যেমন মাটির উর্বরতা বাড়ে তেমনই এই সার ফসলের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। বেশি করে গোবর সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমবে। এছাড়া নিজের জমিতে যেমন ব্যবহার করা যাবে, তেমনি অতিরিক্ত গোবর সার বিক্রি করে আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি হবে। কম পরিশ্রমে ও সহজ উপায়ে এই সার প্রস্তুত করা যায়। গোবর সার, আশেপাশের অব্যবহৃত উঁচু জমিতে প্রস্তুত করা যায়, মূলধনও অনেক কম লাগে।

লাউ-এর চাহিদা বাড়ছে

লাউ আমাদের কাছে একটি অতি পরিচিত সবজি। তবে বর্তমানে হাইব্রিড প্রজাতির লাউ চাষ অত্যন্ত লাভজনক। অতি অল্প সময়ে এই লাউ চাষ করে চাষীরা দারুণ সাফল্য পেয়েছেন। জমিতে লাগানোর ২ মাস পরে গাছ ফলে ভরে যায়। প্রয়োজন মতো সেচ, জৈব রাসায়নিক সার দেওয়াটাও অত্যন্ত জরুরি। লাউ ক্ষেতে ছোট-ছোট কালো মাছির উপদ্রব খুবই দেখা যায়। তাই বাজার থেকে হরমোন ফাঁদ কিনে মাচায় দিতে হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে কীটনাশকের খরচ যেমন কমবে এবং লাভের পরিমাণও বাড়বে যথেষ্ট।

ক্যাপসিকাম চাষে যত্ন নিতে হবে

ক্যাপসিকাম অতি জনপ্রিয় একটি সবজি। তবে অনেক সময় ক্যাপসিকাম গাছে ছোট-ছোট পোকার আক্রমণ হয় এবং এরা পাতার নীচে বসে রস চুষে খায়। এর ফলে গাছ পাতা কুঁকড়ে যাওয়া রোগের কবলে পড়ে। সেজন্য ইমিক্লোরপ্রিড ০.৫ মিলি ৩ লিটার জলে ও ডাইমিথোয়েট প্রতি লিটার জলে ১.৫ মিলি হারে গুলে স্প্রে করতে হবে। এ বিষয়ে জানতে কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের পরামর্শ নিলে সুফল পাওয়া সম্ভব।

সাবধানে করুন তিল চাষ

তিল চাষে চাষীদের সতর্ক থাকতে বলেছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। কারণ, গাছে ফুল আসার সময় রোগপোকার আক্রমণ দেখা যায়। এতে গাছে ফাইলোডি, পাতা মুড়ে যাওয়া, গোড়া পচা প্রভৃতির আক্রমণে ফুল ও ফল ঠিকমতো ধরে না। ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই পোকার আক্রমণ হলে সেই গাছ তুলে ফেলতে হবে। তারপরও পোকার আক্রমণ হলে পাঁচ-ছয় লিটার জলে এক গ্রাম ক্লোথানেডিন গুলে চাষের জমিতে স্প্রে করতে হবে। গাছের কাণ্ড খেয়ে নেওয়া লেদাপোকার আক্রমণ ঠেকাতে নিমজাতীয় কীটনাশক ছড়াতে হবে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, মাটিতে অম্লের পরিমাণ বেশি থাকলে তা গাছের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।
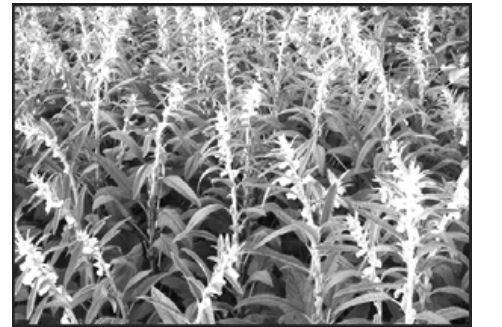
শ্বেতচন্দন চাষে আয় বৃদ্ধি

দেশের কৃষকদের আর্থিক উন্নতির একটাই উপায়, তা হলো স্বল্প ব্যয়ে আরও বেশি মুনাফা অর্জন। ক্ষুদ্র থেকে বড়, প্রতিটি কৃষকের লক্ষ্য কৃষিকাজ করে উপার্জনের সাথে সাথে নিজেদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। চন্দনকাঠের চাষ বেশ লাভজনক। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, আমাদের দেশের পাশাপাশি বিদেশেও এর ব্যাপক চাহিদা আছে। চন্দনকাঠ চাষে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে, তার থেকে বহুগুণ বেশি অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। এই চাষে আয় করতে কমপক্ষে ১৫–২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। শ্বেতচন্দন গাছগুলিকে চিরসবুজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর থেকে উৎপাদিত তেল এবং কাঠ ঔষধ তৈরি করতেও ব্যবহৃত হয়। শ্বেতচন্দন কাঠের তেল, সাবান, প্রসাধনী এবং আতর সুগন্ধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চন্দন গাছ দুটি উপায়ে প্রস্তুত করা যায়, প্রথমটি জৈব চাষ এবং দ্বিতীয়টি ঐতিহ্যবাহী উপায়ে চাষ। অন্যান্য গাছের তুলনায় চন্দন গাছ বেশ ব্যয়বহুল। এই চাষে সেচ তেমন লাগে না বললেই চলে। প্রথম দু–বছর সামান্য যত্ন নিতে পারলেই আর কোনো অসুবিধা হয় না।

মাছের চাষ যখন প্রাকৃতিক খাদ্যে

মৎস্য বিশেষজ্ঞদের মতে, জলাশয়ের উদ্ভিদকণা যা মাছের প্রাকৃতিক খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই উদ্ভিদকণা মূলত ফসফেট, ক্যালসিয়াম, নাইট্রোজেন শোষণ করে বৃদ্ধি পায়। মনে রাখা প্রয়োজন, উদ্ভিদকণা শুধু মাছের প্রাকৃতিক খাবার নয়, জলাশয়ের অক্সিজেন বৃদ্ধিতে এদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। দিনের বেলা উদ্ভিদকণা জলের CO_2 শোষণ করে এবং সূর্যালোকের প্রভাবে খাদ্য তৈরি করে। সেই সঙ্গে জলে অক্সিজেন যোগ করে। পুকুরে জৈব পদার্থ যত বেশি হয় প্রাণীকণার সংখ্যা তত বেড়ে যায়। ছোট মাছের ক্ষেত্রে এই প্রাণীকণাই একমাত্র খাদ্য। তাই যে জলাশয়ে সবসময় উদ্ভিদকণা ও প্রাণীকণার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে, সেখানে মাছ চাষের উপযুক্ত জলাশয়। তা না হলে মাছ অপুষ্টি রোগের শিকার হয়। সঠিক মাছ চাষের ব্যাপারে সর্বদা স্থানীয় মৎস্য আধিকারিকের পরামর্শ মেনে চাষ করা উচিত।

বীট চাষে আয়

বর্তমানে চাষীরা বীট চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন। বীটের উচ্চফলনশীল জাতগুলি হলো রুবি, কুইন, ডেট্রইট ডার্ক রেড ইত্যাদি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চাষীরা ডেট্রইট ডার্ক রেড প্রজাতিকে চাষের জন্য বেছে নিয়েছেন। এই প্রজাতির বীটের রঙ গাঢ় লালচে–কালো ও গোলাকার এবং এর স্বাদও বেশ মিষ্টি। সঠিকভাবে ও সঠিক নিয়ম মেনে এর চাষ করতে পারলে, বীটের ওজন হবে ২০০ গ্রাম থেকে ২৫০ গ্রাম। এর একটা বীজ থেকে অনেকগুলি চারা বের হয়। ৯০ দিনের মাথায় এই ফসল তুলে নেওয়া হয়।

হলুদের কন্দপচা রোগ

হলুদ আমাদের সবার কাছেই অতি পরিচিত। তবে হলুদের কন্দপচা নামক এক রোগ হয় যা এই গাছকে শুকিয়ে মেরে ফেলে। এই রোগ থেকে গাছকে বাঁচাতে জমিতে ট্রাইকোডারমা ও ফ্লুরোমেন্ট মিউডোমোনাস বিঘাপ্রতি যথাক্রমে ১.৫ কেজি ও ৩ কেজি হারে মূল সার ও চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এরপর এই রাসায়নিক ৪–৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজ সারে মিশিয়ে সেই বীজ–কন্দ রুইতে হবে। এর ফলে কন্দপচা ছাড়াও অন্যান্য রোগপোকার আক্রমণ থেকে আক্রান্ত গাছকে বাঁচানো সম্ভব।

ছত্রাক রোগ থেকে পেঁপেকে রক্ষা করুন

পেঁপে আমাদের কাছে একটি অতি পরিচিত ফল। তবে এই পেঁপে গাছে একটি বিশেষ ধরনের ছত্রাকঘটিত রোগ দেখা যায়।

এই বিশেষ ধরনের রোগটি হলো ঢেঁড়ি রোগ। গাছের পাতা, কাঁচা পেঁপে এবং পাকা পেঁপের গায়ে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত অংশের রঙ হয়ে যায় ফিকে হলদে। পেঁপের যে অংশ রোদের দিকে থাকে, সেখানেই এরকম দাগ দেখা যায়। ক্ষতস্থানে সমকেন্দ্রিক প্রায় গোল কালো দাগ পড়ে। বড় বড় দাগগুলির উপরে ফিকে লাল বা গোলাপি রঙের গুটি দেখা যায়। গুঁড়ি বা কাণ্ডের রোগাক্রান্ত অংশের বিপরীত দিকটি অনেক সময় চুপসে যায়। সেই স্থান ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে গাছ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এর প্রতিকার হিসাবে গাছের ফল ও কাণ্ডকে প্রচণ্ড সূর্যকিরণের হাত থেকে সারা গ্রীষ্মকাল রক্ষা করা দরকার। শুকনো কলাপাতা দিয়ে কাণ্ড ও ফলগুলিকে বেঁধে দিলেই তা রক্ষা করা সম্ভব। ছত্রাকনাশক স্প্রে প্রয়োগ করে ছত্রাকের সংক্রমণ দমন করা সম্ভব।

উৎসাহ বাড়ছে কালোজিরে চাষে

কালোজিরে রান্নার এক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। যেকোনো রান্নায় কালোজিরে অত্যন্ত প্রয়োজন। সর্দিতে কালোজিরের জুড়ি মেলা ভার। কালোজিরে অত্যন্ত অর্থকরী মশলা। অর্থকরী ফসল হিসেবে চাষীরা এই ফসলকে বেছে নিয়েছেন। চাষীরা জানান, মাত্র ১০০-১১০ দিনেই কালোজিরে বিঘাপ্রতি ২ কুইন্টাল ফলন দিতে সক্ষম। সারা দেশ জুড়ে এই কালোজিরের চাহিদা আছে। তবে কালোজিরের চারা ঢলে পড়ার রোগ আছে। তাই এই রোগকে প্রতিহত করতে সঠিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করাই একমাত্র পথ। সঠিক নিয়ম মেনে কালোজিরে চাষ করলে এর থেকে চাষীরা ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।

যুগ্ম ফসলে আয়

বর্তমানে চাষীরা বেশি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করার জন্য যুগ্মফসল বা একটির সাথে দুটি ফসল চাষ করার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁরা পটল ও লঙ্কা চাষের মাধ্যমে বেশি আয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। একই সাথে দুটি ফসল চাষ করতে পেরে চাষীরা আনন্দ বোধ করেন এবং লাভ দ্বিগুণ করার চেষ্টা করেন। এই চাষের জন্য উর্বর জমি, সঠিক জলবায়ু, রাসায়নিক সার ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। চাষীভাইরা বলছেন, কীটনাশক প্রয়োগ না করে শুধুমাত্র ১৫ কাঠা জমিতে ৫০ কেজি সুপার ফসফেট সারের সঙ্গে দুই বস্তা মুরগির বিষ্ঠা মিশিয়ে প্রয়োগ করে পটল চাষে ভালো লাভ করা যেতে পারে। পটল চাষের মাচার সঙ্গে মাঝে মাঝে লঙ্কা চাষ করতেও দেখা গেছে। এইভাবে যুগ্ম চাষের মাধ্যমেও ভালো ফলন পাওয়া যায়। এই চাষে বাজার দরও ভালো পাওয়া যাবে এবং উন্নতির মুখ দেখবেন বলে আশা করছেন চাষীরা।

মুরগি পালনে সতর্কতা

মুরগি পালন করতে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। এই মরশুমে বিশেষত মুরগির ছোট বাচ্চার নিউমোনিয়া রোগ দেখা যায়। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াই মূলত এর জন্য দায়ী। এই সময় মুরগির শ্বাসকষ্ট হয়, খাবার খেতে অরুচি দেখা যায় এবং বেশি পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও চোখ ফুলে যায়। এই সময় খাবার শুকনো জায়গায় রাখতে হয়, তিন-চার দিনের বেশি খাবার জমিয়ে রাখা যাবে না। খাবারের সঙ্গে টক্সিন বাইন্ডার ৫০০ গ্রাম-১ কেজি প্রতি ঘনমাত্রায় মেশাতে হবে। প্রতিবার নতুন চিক আসার আগে ব্রুডার বক্স বা হোভার ইত্যাদিকে থায়াবেন্ডাজোল দিয়ে স্প্রে করা প্রয়োজন। তবে এর মাত্রা হবে ১২০ গ্রাম/ঘনমিটার।

খবরাখবর

ছায়াপথের বাইরে গ্রহের হদিশ
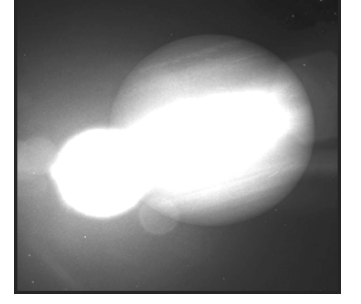
পৃথিবী নামের এই গ্রহে আমাদের বাস হলেও ব্যাপক অর্থে আমরা সকলেই কসমস-এর (Cosmos) বাসিন্দা। তাই পৃথিবী ও তার প্রাণপ্রাচুর্যের স্বরূপকে বুঝতে এই ব্রহ্মাণ্ডকে চেনা জরুরি। সেই চেষ্টাই বছরের পর বছর ধরে করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। সৌরজগতের বাইরে নানা গ্রহ, যাদের 'এক্সোপ্ল্যানেট' (Exoplanet) বলা হয়—তাদের নিরীক্ষণ করে নানা তথ্য হাতে এসেছে। কিন্তু এবার এমন এক গ্রহের দেখা মিলল যা অবস্থিত এই বিশাল ছায়াপথেরও বাইরে। নাসার চন্দ্র এক্সরে অবজার্ভেটরির এই আবিষ্কার ঘিরে শোরগোল বিজ্ঞানী ও মহাকাশপ্রেমী মহলে। এ যাবৎ প্রায় ৪ হাজার এক্সোপ্ল্যানেটের সন্ধান মিলেছে। এদের কারও চেহারা-চরিত্র প্রায় পৃথিবীর মতো, কোনও কোনও গ্রহের সঙ্গে বৃহস্পতির উষ্ণ চরিত্রের মিল পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও নানা ধরনের গ্রহের দেখা মিলেছে। কিন্তু সেগুলি কোনোটিই ছায়াপথের বাইরে নয়। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ৩ হাজার আলোকবর্ষের মধ্যেই অবস্থিত সেই গ্রহগুলি। কিন্তু ওই গ্রহটি প্রায় ২.৮ কোটি আলোকবর্ষ দূরে। সুদূরে অবস্থিত এই গ্রহটি পাক খাচ্ছে একটি ব্ল্যাকহোলের চারপাশে। গ্রহটির সঙ্গে মিল রয়েছে শনিগ্রহের। ঠিক কিভাবে বিজ্ঞানীরা অত দূরে অবস্থিত গ্রহদের খোঁজ পান? এসব ক্ষেত্রে অন্যান্য নক্ষত্র থেকে নির্গত আলোর গতিপথ অনুসরণ করা হয়। যখনই কোনো গ্রহ তার সম্মুখে আসে, তখনই সেটি আলোর গতিপথ রুদ্ধ করে। ফলে আলোর গতিপথের দিকে নজর রাখলেই গ্রহটিকেও নজর করা সম্ভব হয়। টেলিস্কোপের সাহায্যে নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেলেন অন্য এক ছায়াপথের গ্রহের।

মেরুর গলা বরফে আশঙ্কা পরিবেশবিদ্‌দের

উষ্ণায়নের অভিশাপে হিমবাহ গলন নতুন ঘটনা নয়। গত দশক থেকেই তা চলছে। গলনের প্রভাবে যে কতশত বিপর্যয় নেমে আসছে পৃথিবীতে, তা হিসেবের বাইরে। মেরুর বরফ গলতে গলতে নীচের স্তর থেকে বেরিয়ে আসবে বহু যুগ ধরে চাপা পড়ে থাকা অজানা সব জীবাণু। এমনকী বেরিয়ে আসতে পারে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যও। উত্তর মেরু এলাকার একটা অংশে প্রায় লক্ষ বছর ধরে বরফ জমেছে। স্থায়ীভাবে হিমায়িত হয়েছে এই অংশ। কিন্তু উষ্ণায়নের কোপে এবার সেই অংশও গলতে শুরু করেছে। আর তার মাঝ থেকেই উঠে আসছে প্রচুর অণুজীবী। বিশ্বের শীতলতম অঞ্চল সাইবেরিয়ার হিমায়িত অংশ মূলত জীবাণুরোধী। উষ্ণায়নের হার দেখে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, ২১০০ সালের মধ্যে মেরু অঞ্চলের এই স্থায়ী হিমায়িত অংশের দুই-তৃতীয়াংশ গলে যাবে। শীতল যুদ্ধের সময় যেসব পরমাণু চুল্লি, সাবমেরিনের অংশ এতদিন ধামাচাপা পড়েছিল, সেসবও বেরিয়ে আসবে স্থায়ী হিমায়িত অংশ গলে গেলে। অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অভিশাপও নেমে আসবে। এর জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় অংশেই প্রভাব পড়বে।

জয়ের আবিষ্কার

চট্টগ্রামের হাটহাজারীর ১৯ বছরের এক তরুণের কৃত্রিম অঙ্গ (রোবোটিক্স হ্যাণ্ড, থার্ড হ্যাণ্ড, ওয়্যারলেস হ্যাণ্ড) এবং আরও বেশ কয়েকটি তার উদ্ভাবনী প্রোজেক্ট তৈরির ফলে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে এই সংবাদ দেখেছে ৬০ লাখেরও বেশি মানুষ। শুধু চট্টগ্রাম নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত, এমনকী আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকেও তার সাথে যোগাযোগ করা হয়, যাদের অধিকাংশের হাত কিংবা পা নেই অথবা অনেকে তাদের স্বজনের জন্য এই যোগাযোগ করেন। এই তরুণের নাম জয় বড়ুয়া লাভলু (Joy Barua Lablu)। তবে তার বাড়িতে গিয়ে সাংবাদিকরা দেখতে পান, এই কাজের জন্য যে ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন সেই পরিবেশটা নেই। শুধুমাত্র তার অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে সে কাজ করে যাচ্ছে। যখন এত মানুষের জন্য সে কাজ করতে যাবে, তার জন্য অবশ্যই একটি কাজের পরিবেশ দরকার। যিনি জন্ম থেকে কিংবা দুর্ঘটনার কবলে হাত হারিয়েছেন, তাঁর জন্য এই 'রোবোটিক্স হ্যাণ্ড' বিশাল বড় আশীর্বাদ। বাণিজ্যিকভাবে কেউ চাইলে এই কাজ তাঁকে দিয়ে শুরু করা যেতে পারে বলে জানিয়েছে জয় বড়ুয়া।

'রোবোটিক্স হ্যাণ্ড' তৈরি করতে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ পড়ে। এই হাতগুলো তৈরি করতে যে ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন, তার সিংহভাগ বাইরে থেকে আনতে হয়। তবে বাণিজ্যিকভাবে এই কাজ শুরু করা গেলে খরচ ১০ হাজার টাকার মধ্যে নেমে আসতে পারে বলে অভিমত জয়ের। এর পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া গেলে হয়তো রাষ্ট্রের জন্য আরও ভালো কিছু বয়ে আনতে পারে জয়।

গ্রামীণ সংবাদ

শ্রী নারায়ণ দেবনাথ

প্রতি বছরের মতো এবছরও প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি ১১৯ জনকে অসামরিক পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত করেন। এর মধ্যে ৭ জন পদ্মবিভূষণ, ১০ জন পদ্মভূষণ ও ১০২ জন পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হন। বাঙালি ৭ জন পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। ছোটদের বড় আদরের 'বাঁটুল দি গ্রেট', 'নন্টে ফন্টে', 'হাঁদা ভোঁদা'র জনক শ্রী নারায়ণ দেবনাথকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মাথা বি. মানজাম্মা জগাতি

এবারের পদ্মশ্রী পুরস্কারে অভিনবত্ব হলো প্রান্তিক মানুষের পুরস্কারপ্রাপ্তি। কর্ণাটকের মাথা বি. মানজাম্মা জগাতি। ইনি রূপান্তরকামী হয়েও লোকনৃত্যশিল্পী হিসাবে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাকে এই সম্মান দেওয়া হয়।

গুরুমা কামালী সোরেন

পশ্চিমবঙ্গের গুরুমা কামালী সোরেন সমাজসেবার জন্য এই সম্মানে ভূষিতা হন। যে আদিবাসী শ্রেণীকে আমরা সেবা করি বলে গর্ব করি, সেই আদিবাসী মা নিজেই সেবিকা।

মহম্মদ শরিফ

অযোধ্যার মহম্মদ শরিফ ৮১ বছর বয়সে ২০২০ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ঘোষিত হয়ে ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে এই সম্মানে ভূষিত হন। পেশায় তিনি সাইকেল মেরামতির একজন কর্মী। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সঠিক পরম্পরা অনুযায়ী পরিচয়-হীন মৃতদেহকে অন্তিম সংস্কার করে চলেছেন। প্রায় তিন হাজারের ওপর এমন অন্তিম সংস্কার করেছেন তিনি। এই ব্যতিক্রমী সমাজসেবার জন্য তিনি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন।

শ্রীমতী রাহিবাঈ সোমা পোপারে

২০২০ সালের মনোনীত একজন গ্রাম্য প্রান্তিক চাষী শ্রীমতী রাহিবাঈ সোমা পোপারে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিতা হন। ইনি চাষীদের নানা ধরনের বীজ দিয়ে সাহায্য করে চাষে উৎসাহিত করেন। বিজ্ঞানী রঘুনাথ মাসহেলবর এঁনাকে 'Seed mother' উপাধি দেন। ইনি মহারাষ্ট্রের আহম্মেদ নগরের বাসিন্দা।

হরেকালা হাজাব্বা

হরেকালা হাজাব্বা কর্ণাটকের এই মুসুম্বি বিক্রেতা লাভ্যাংশ জমিয়ে গ্রামের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় বানিয়েছেন। নিজে জীবনে শিক্ষার আলো না পেয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা যেন পরবর্তী প্রজন্ম না পায় তার জন্য তাঁর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন।

সুখোই-৩০-এর সফল নিক্ষেপ

দেশের প্রথম দূরপাল্লার বোমা-র পরীক্ষায় সফল হলো ভারত। ভারতীয় বায়ুসেনা এবং ডিফেন্স রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছে এই অস্ত্র। আর উড়িষ্যার বালাসোরে সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এই দূরপাল্লার বোমা। এতে সাফল্যের সাথে উতরে গিয়েছে দেশ। প্রায় হাজার কেজি গোলাবারুদ বইতে পারে এই বোমা। এদিকে L.R. বোমের সফল নিক্ষেপ সমরাস্ত্রের দিক থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে দিল দেশকে। একেবারে নিখুঁত নিশানায় ১০০ কিলোমিটার দূরে থাকা শত্রু ঘাঁটিকে উড়িয়ে দিতে পারে এই বোমা। পোখরানে Anti Airfield Weapon-এর পরীক্ষা করেছিল দেশ। তারপরই এই লং-রেঞ্জ বোমার সফল নিক্ষেপ। সমর বিশেষজ্ঞদের দাবি, ভারতীয় সেনাকে সব দিক থেকে আরও শক্তিশালী করেছে এই অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র।

কৃষি খবর

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আপেল

আপেলের নাম শুনলেই আমাদের চোখের সামনে সবুজ বা লাল আপেলের ছবি ভেসে ওঠে। সম্প্রতি 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আপেল' নামে একটি দুর্লভ জাত পাওয়া গেছে যেটি মূলত হুয়া নিউ আপেলের বংশোদ্ভূত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আপেলগুলো পাহাড়ের দেশ তিব্বতে জন্মায়। তাই সেখানকার ভৌগোলিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাবে এদের রঙ একটু আলাদা হয়ে থাকে। তিব্বতের ছোট শহর নাইংগিছিতে এই আপেলের চাষ হয়—যেখানে দিনের বেলায় প্রচুর সূর্যের আলো পড়ে। অতিরিক্ত সূর্যের আলোর কারণে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি সরাসরি আপেলের ত্বকে পড়ে। এর ফলে এই আপেলের রং কালো হয়ে যায়, তিব্বত ছাড়াও এই জাতের আপেল পাওয়া যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে।

বনদপ্তরের উদ্যোগে ফলের বাগান

পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে লালমাটিতে ফলের বাগান তৈরি করছে বনদপ্তর। পুরুলিয়া মফস্‌সল থানার ছর্‌রাতে ১১ ব্যাটালিয়ানের ১০ হেক্টর জমি জুড়ে তৈরি হচ্ছে এই বাগান। গোটা জেলার মধ্যে ছর্‌রাতেই বনদপ্তর সবচেয়ে বড় ফলের বাগান তৈরি করছে বলে দাবি আধিকারিকদের। করোনা পরিস্থিতিতে ওই বাগান তৈরিতে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে এই গ্রামে ১৯৩ জন শ্রমিক ইতিমধ্যেই কাজ পেয়েছেন। তিন বছর অপেক্ষার পরে এই বাগান থেকে ফল পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

বর্ধমানে প্রচুর নার্সারি

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন ২৯টি নার্সারি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে ২১টি নার্সারি ব্লক স্তরে ও ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে হবে। ব্লক স্তরের প্রত্যেকটি নার্সারিতে বছরে প্রায় এক লক্ষ চারা তৈরি হবে। জেলার বিভিন্ন স্বনির্ভর দলকে দিয়ে জেলা প্রশাসন ওই নার্সারি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের প্রত্যেক বছর নিখরচায় বিভিন্ন ফল ও বৃক্ষজাতীয় গাছ বিলি করা হয়। বর্ষায় বিভিন্ন চারা বিলি করার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় ১০০ দিনের প্রকল্পে রাস্তার ধারে ও ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগান হয়। এই কর্মসূচী প্রতিবারের মতো এবারেও জোরদার হয়েছে।
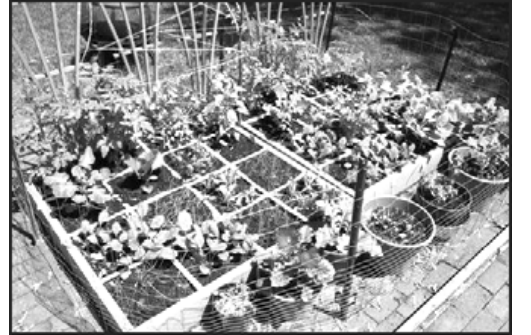
ছাগল পালনে বাণিজ্যিক দিক

বর্তমানে কিছু কৃষক কৃষিকাজের পাশাপাশি পশুপালনের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। পশুপালনের মধ্যে ছাগল পালন করে আপনি এখন অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন। ছাগল পালনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, বাজারের জন্য স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ হয়। ছাগল গ্রামাঞ্চলে বরাবরই জীবিকার নিরাপদ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। ছাগল রক্ষণাবেক্ষণের খরচও অনেক কম। এছাড়া এটি বিক্রি করে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা সম্ভব হয়। সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক ধরনের ছাগলের জাত আছে। এর মধ্যে কিছু জাত মাংসের জন্য ও কিছু জাত ডেয়ারির জন্য বিখ্যাত। সাধারণত দুধ, মাংস এবং চামড়ার জন্য এদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্যবসার কাজে লাগাতে হলে সবসময় ভালো প্রজাতির ছাগল ব্যবহার করা উচিত।

স্বাস্থ্যগুণে ভরা মিষ্টি তেঁতুল

মিষ্টি তেঁতুল জঙ্গল জালেবি বলে পরিচিত। এই ফসলকে ক্রান্তীয় ভারতীয় ফল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কর্ণাটকে এই ফলের চাষ দেখা যায়। এই গাছটি সাধারণত ১৪ থেকে ১৮ মিটারের হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায় এই তেঁতুলের ব্যাপক চাষ

হয়। এই তেঁতুলে প্রোটিন, ক্যালোরি, ডায়েট্রি ফাইবারস্, কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট শক্তির প্রয়োজনে সাহায্য করে এবং হজমে এর সাথে ডায়রিয়ার চিকিৎসা, রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখতে এবং দাঁতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এই ফলগুলি সম্পূর্ণরূপে আয়রন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি এবং সি সমৃদ্ধ।

কাঁকসার জঙ্গলমহলে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগ

এবার পুকুর থেকে সরাসরি পৌঁছে যাবে সবজি চাষের জমিতে জল। ফোয়ারার মাধ্যমে হবে সেচ। কৃষি দপ্তরের এই নতুন উদ্যোগে খুশি কৃষকরা। কৃষিকাজকে আরও মজবুত করতে কাঁকসার জঙ্গলমহলের গ্রামগুলিতে কৃষি সেচ যোজনার মাধ্যমে সেই পুকুরের জল সবজি চাষে লাগান হবে পাইপ লাইন করে ফোয়ারার মাধ্যমে। কাঁকসার কৃষি দপ্তর থেকে কৃষি সেচ যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনা খরচায় কাটা হয়েছে পুকুর। পুকুর থেকে পার্শ্ববর্তী চাষের জমিতে যাতে করে সহজেই সেচের জল পৌঁছে যায় সেজন্য দেওয়া হয়েছে পাম্প। উপকৃত হচ্ছেন বহু চাষী। অন্যদিকে কৃষি সেচ প্রকল্পের আওতায় কাটা হয়েছে পুকুর। সেই পুকুরগুলিতে মাছ চাষ করে উপকৃত হবেন চাষীরা।

ভেষজ গুণের জন্য পুদিনা চাষ

ভেষজ গুণের জন্য পুদিনা চাষ অত্যন্ত লাভজনক। কোনোপ্রকার রাসায়নিক কীটনাশক বা সার ব্যবহার না করেই এই চাষ সম্ভব। জৈব পদ্ধতিতেই পুদিনা চাষ সম্ভব। বেলে-দোঁয়াশ মাটি ও উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা এই চাষে উপযুক্ত। মাঘ মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত পুদিনা চাষ হলেও, এখন সারা বছরই এই চাষ সম্ভব। সামান্য পুঁজি ও অল্প পরিশ্রম করে পুদিনা চাষ করলে যথেষ্ট লাভ করা সম্ভব।

বাড়ির টবে সূর্যমুখী ফুল চাষ

নার্সারি থেকে গাছের জন্য ভালো বড় টব কিনে আনতে হবে। অল্প ভেজা ভেজা মাটি প্রয়োজন এই চাষ করতে। তার মধ্যে জৈব সার মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। টবের মাটিতে বীজটি পুঁতে দিন। রোজ দুবেলা করে প্রয়োজন মতো জল দিতে হবে। তবে এই চাষে গাছের গোড়ায় জল জমতে দেওয়া যাবে না। মাটি স্যাঁতসেঁতে থাকলে জল দেবেন না। এক মাস হওয়ার পরই গাছের গোড়ায় বাড়তি সার দিতে হবে প্রয়োজন মতো। এই পদ্ধতিতে চাষ করলে সূর্যমুখী টবেই সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে।

চালকুমড়ো চাষ পদ্ধতি

চালকুমড়ো আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় ও সহজলভ্য সবজি। গ্রামাঞ্চলে ঘরের চালে এই সবজি গাছ উঠানো হয় বলে এটি চালকুমড়ো নামে পরিচিত। তবে মাচায় এর ফলন বেশি হয়। কচি চালকুমড়াকে জালি বলা হয়। এটি তরকারি হিসেবে এবং পরিপক্ক চালকুমড়ো মোরব্বা ও হালুয়া তৈরিতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

মাটি ঃ চালকুমড়ো চাষের আগে মাটি নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি। এটি দোঁয়াশ মাটিতে ভালো জন্মায়। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাদামাটি ছাড়া যেকোনো মাটিতে এর চাষ সম্ভব। এই চাষ করতে জমিতে মাদার উচ্চতা হবে ১৫-২০ সেমি, প্রস্থ হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমি সুবিধা মতো নিতে হবে। এইভাবে কৃষি বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ও পরামর্শে চালকুমড়ো চাষ হবে সহজ ও অধিক লাভদায়ক।

ঝিনুক মাশরুমের চাষ

অনেক ধরনের ছত্রাকের মধ্যে পুষ্টিগুণসম্পন্ন ভোজ্য ছত্রাক হলো মাশরুম। এই মাশরুমের চাহিদা বাজারে বেশ ব্যাপক। এটা এমন এক খাবার যেটা খাদ্যগুণের নিরিখে প্রায় আমিষের সমান। কম ক্যালোরি হওয়ায় হৃদরোগীদের খাবার হিসাবে খুবই ভালো। আমাদের দেশে মূলত তিন ধরনের মাশরুম চাষ হয়, যথা বোতাম, পোয়াল ও ঝিনুক। এর মধ্যে সহজেই বাড়িতে চাষ করা যায় ঝিনুক মাশরুম। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝিনুক মাশরুম চাষের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। খুব গরমকাল বাদ দিলে প্রায় সারা বছর এই মাশরুম চাষ করা যায়। তবে সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে এই চাষ করতে পারলে ভালো হয়।

পুসা ট্যাবলেটের ব্যবহার

১৯৬০-এর দশকে, সবুজ বিপ্লবের অংশ হিসাবে প্রধানত পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার কৃষকদের ধান-গম এই দুটি ফসলের আবর্তন অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল—যাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতকে স্বনির্ভর করা যায়। এরই ফলস্বরূপ কৃষকদের কাছে থাকা একমাত্র সহজ এবং সস্তা বিকল্পটি হলো জমিতে পড়ে থাকা ফসলের অবশিষ্টাংশগুলি পুড়িয়ে ফেলা। কারণ, খরিফ মৌসুমের শেষে ধান কাটা ও গম বপনের মধ্যে খুব অল্প সময়কাল থাকে এবং অপরদিকে ধানের খড় যা মাঠে থেকে যায়, তা অপসারণ করাও অত্যন্ত শ্রম-নিবিড় প্রক্রিয়া। পুসা কম্পোস্ট প্রযুক্তি হলো একটি তরল গঠনের বা ক্যাপসুল আকারের জীবাণুভিত্তিক কৌশল যা বর্জ্যগুলিকে পচিয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ কম্পোস্টে রূপান্তরিত করে। এই ক্যাপসুল ব্যবহারে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। ক্যাপসুল ব্যবহারের ফলে খামারপ্রাপ্ত বর্জ্যগুলি পচে যায় এবং মূল্যবান কম্পোস্ট উপকরণগুলিতে পরিণত হয়। এই ক্যাপসুল জমির আর্দ্রতা আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য বজায় থাকে। এই ক্যাপসুল ব্যবহার করলে মাটি বা বায়ু দূষণ না করেই কৃষকরা পরবর্তী ফসল চাষের জন্য ক্ষেতগুলি প্রস্তুত করে তোলে। ক্যাপসুলগুলি আকারে ছোট এবং কৃষকদের কাছে ক্রয় ক্ষমতাযোগ্য।

কম খরচে গ্লাডিওলাস ফুল চাষ

পরম্পরাগত কৃষির তুলনায় গ্লাডিওলাস ফুলের চাষ করে কৃষকরা সাধারণত অনেক বেশি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এই ফুলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয় অনুষ্ঠানে সাজসজ্জার জন্যে। এই ফুলের চাষ যেহেতু অত্যন্ত লাভজনক সেই কারণে খোলা জমিতে এর চাষবাসকে কৃষকরা অনেক বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে, এর ফলে কৃষকদের চাষের খরচ কম ও লাভ অনেক বেশি হচ্ছে।

এই ফুলের চাষ প্রধানত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভালোভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। শেষ চাষ দেবার সময় প্রতি বর্গমিটারে ৫-৬ কেজি গোবর সার, ৬০ গ্রাম এস এস পি এবং ৩০ গ্রাম এম ও পি সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গ্ল্যাডিওলাসে বেশি ইউরিয়া সার দেওয়া উচিত নয়। তবে সেচের পরিমাপ কম থাকলে গাছের বৃদ্ধি কমে যাবে। জমিতে জলের পরিমাণ যেন বেশি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষ

ফসলের ক্ষেতে আর্দ্রতা সংরক্ষণে মালচিং বিশেষভাবে উপকারী। কারণ এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে, ফসল ক্ষেতের জল সূর্যের তাপ ও বাতাসে দ্রুত উড়ে যায় না। ফলে জমিতে রসের ঘাটতি হয় না এবং সেচ লাগে অনেক কম। মালচিং ব্যবহার করলে জমিতে ১০% থেকে ২৫% আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। মালচিং করার জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হলো জৈব ও অজৈব পদার্থ। এর উপাদানগুলো হলো ধান বা গমের খড়, কচুরিপানা, গাছের পাতা, শুকনো ঘাস, কম্পোস্ট ভালোভাবে পচানো রান্নাঘরের আবর্জনা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, মালচিং পদার্থের পুরুত্ব বেশি হলে তা গাছপালার অনাকাঙ্ক্ষিত মূল গজাতে সহায়তা করবে। সঠিক মালচিং প্রয়োগ বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের আক্রমণও রোধ করা যায়। শীতকালে মালচিং ব্যবহার করলে মাটিতে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ধরে রাখা সম্ভব হয় এবং গরমকালে মাটি ঠাণ্ডা থাকে, এমনকী বেশ কিছু পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধ করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, মালচিং প্রযুক্তি ব্যবহার করলে জল লাগে অনেক কম, সেচ খরচ বাঁচে, লাভ হয় বেশি। টম্যাটো, বেগুন, লঙ্কা, ক্যাপসিকাম, স্ট্রবেরি ইত্যাদির চাষে মালচিং খুবই ফলপ্রদ ও লাভজনক পদ্ধতি।

কম খরচে এলাচ চাষ

আমাদের রাজ্যে এলাচ খুব বেশি পরিমাণে চাষ না হলেও দেশে এবং বিদেশে যেমন আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের শীতপ্রধান অঞ্চলে এটি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এলাচ চাষের জন্য উর্বর মাটি এবং হালকা রৌদ্র–ছায়াযুক্ত জায়গায় এলাচ গাছ ভালো জন্মায়। ভেজা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ছায়ার মধ্যে এলাচ গাছের ফলন ভালো হয়। অন্য গাছের ছায়ার নীচে অর্থাৎ মেহগনি, আকাশমণি বা এ জাতীয় বাগানের ভিতর অথবা বাড়ির আঙিনা অথবা ফলদ বৃক্ষের বাগানে এলাচ চাষ করলে এলাচের ভালো ফলন হয়। অন্য ফসলের মাঠে এলাচ চাষ করলে ফলন ভালো পাওয়া যায় না।

তেহট্টে বাড়ছে কলা চাষ

তেহট্ট মহকুমা জুড়ে বাড়ছে কলা চাষ। গতানুগতিক চাষের পরিবর্তে কলা চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন চাষীরা। তাই চাষীরা কলা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। চাষী ও ব্যবসায়ী ছাড়াও বহু মানুষ এখন এই চাষের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। যেসব জমিতে আগে পান ও পাটের চাষ হতো, এখন সেখানেই চাষ হচ্ছে কলা। করিমপুর এলাকায় প্রায় ৯০ শতাংশ চাষী কলা চাষ করেন। চাষ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রায় প্রতিটি এলাকায় কলা বিক্রির জন্য হাট তৈরি হয়েছে, যেখানে চাষীদের বিক্রি করা কলা ট্রাক বোঝাই করে বাইরে চলে যাচ্ছে। করিমপুরের এক কলা ব্যবসায়ী বলেন, এলাকার প্রায় ৪০ হাজার মানুষ কলা চাষের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত। করিমপুর থেকেই প্রতিদিন ৪০টি ট্রাক কলা বিক্রির জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে। রাজ্যের বর্ধমান, মালদহ, সিউড়ি, শিলিগুড়ির পাশাপাশি উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড বা বিহার রাজ্যেও কলা রপ্তানি করা হয়।
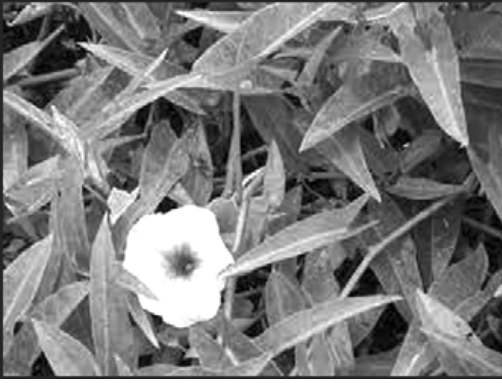
কম খরচে কলমি চাষ

ভারতের অনেক মানুষ শাকাহারি। এর মধ্যে লাউ শাক, কুমড়ো শাক, নটে শাক, এইসব শাক তো বটেই আবার এদের মধ্যে নটে ও কলমি শাক অপরিহার্য। ছোট থেকে বড় সবাই কলমি শাক খেতে পছন্দ করেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এই চাষ ভালো হয়। এই চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ২ কেজি করে বীজ ফেলতে হবে। ঠিক মতো গুরুত্ব দিয়ে পরিচর্যা করতে পারলে বিঘাপ্রতি ১৮–২০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া সম্ভব। তবে বেশি দিন রেখে তুললে বেশি ফলন পাওয়া যাবে। কলমি চাষে তেমন কোনো ঔষধ না লাগায় এই চাষের খরচ অত্যন্ত কম।

চিপসোনা চাষ করে ভালো আয় সম্ভব

চিপসোনা একধরনের আলু। বর্তমান বাজারে যে পট্যাটো চিপস্ বিক্রি হয় তা এই চিপসোনা আলু থেকেই প্রস্তুত করা হয়। বাজারে যেহেতু চিপসের সারা বছর ভালো চাহিদা থাকে, তাই এই চাষে কৃষকদের বিশেষ উৎসাহ দিচ্ছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। এই চাষে কোনো রোগপোকার আক্রমণ নেই বললেই চলে। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব কৃষি ফার্মেই এই জাতের আলু পাওয়া যায়। স্বল্প পুঁজি নিয়ে নেমে এবং অল্প পরিশ্রমে চিপসোনা আলু চাষ করে চাষীরা ভালো লাভ করতে শুরু করেছে।

পাকা লিচুকে বাঁচাতে তৎপরতা প্রয়োজন

বাদুড় পাকা ফলের যথেষ্ট ক্ষতি করে। এর মধ্যে বাদ যায় না পাকা লিচু। বাদুড়ের পাকা লিচু ক্ষতির ফলে চাষীরাও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। ফসল যাতে বাদুড় কোনোভাবে ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্য টিন বা ঢোল পিটিয়ে বাদুড় তাড়ানোর ব্যবস্থা করেন অনেক লিচু চাষী। অনেক ক্ষেত্রেই বড় বড় খোপযুক্ত নাইলনের জাল টাঙিয়ে দেওয়া হয় দুই সারি গাছের মধ্যে। পাকা লিচুকে রক্ষা করতে বা চাষ সংক্রান্ত বিশদ পরামর্শের জন্য রাজ্যের কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

স্বনির্ভর হতে কোয়েল পালন

বর্তমানে কোয়েলের মাংসের যথেষ্ট চাহিদা বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গেও এর চাহিদা কম নয়। কোয়েলের জ্যাপেনিকা, মানচুরিয়ান, হোয়াইট ইত্যাদি প্রজাতির চাষ অত্যন্ত অর্থকরী। একটি পূর্ণবয়স্ক কোয়েলের ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় বার্ড ফ্লু জাতীয় রোগ এদের হয় না। একটি ঘরে অনেকগুলি খাঁচায় কোয়েল পালন করা হয়। এতে জায়গা ও খরচ হয় অত্যন্ত কম। সাত সপ্তাহের মধ্যে স্ত্রী পাখিরা ডিম পাড়তে শুরু করে। এই পাখি পালন করে অনেকেই আজ স্বনির্ভর হয়েছে।

বেবিকর্ণ চাষে উৎসাহ পাচ্ছেন চাষীরা

কৃষিদপ্তর বেবিকর্ণ চাষে চাষীদের উৎসাহ দেবার কাজ জোর কদমে শুরু করেছে। কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বেবিকর্ণ ফসলটি চাষীরা বছরে পাঁচবার সফলভাবে চাষ করতে পারেন। সেখানে মাত্র ৬০ দিনের মধ্যেই বীজ বপন থেকে বাজারজাত করা যায় বেবিকর্ণ। ফলে সেচ, সার বা অন্যান্য পরিচর্চা, খরচের পরিমাণ যথেষ্ট কম। তাই এই চাষে চাষীরা যথেষ্ট উৎসাহ পাচ্ছেন।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে গলদা চিংড়ি চাষ

জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম গলদা চিংড়ি চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে গলদা চিংড়ি চাষে সাফল্য পেলে, একেই পাইলট প্রজেক্ট করে কাজ শুরু করবে। কৃষি দপ্তরের দাবি, এতে মৎস্য চাষীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। চিংড়ি চাষ মূলত নোনা জলে হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দক্ষিণবঙ্গ থেকে চিংড়ির চারা এনে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে এর মধ্যেই চাষ শুরু করা হবে। প্রথম অবস্থায় অল্প সংখ্যক চারা পুকুরে ছেড়ে সেই চারাগুলি উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ায় বাড়ছে কি না তা দেখা হবে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের আশা, তাঁরা পরীক্ষায় সফল হবেন। এর জন্য জেলায় ইচ্ছুক চাষীদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। গলদা চিংড়ি চাষ করে যাতে কৃষকরা সাফল্য পান সেজন্য এবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লাভের উৎস তেলাপিয়া

সাধারণ তেলাপিয়া মাছের চেয়ে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে প্রায় ২০-৩০ শতাংশ উৎপাদন বাড়তে পারে। এই তেলাপিয়া খেতে সুস্বাদু। উৎপাদনের পর চাষীরা পুকুর থেকে এই মাছের দাম পাবেন কেজি প্রতি ১০০ টাকা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে হেক্টর প্রতি খরচ পড়ে আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকা। তিন থেকে চার মাসে এই মাছ বিক্রি করে হেক্টর প্রতি এক লক্ষ টাকার বেশি লাভ করা যায় বলে জানিয়েছেন মৎস্য বিশেষজ্ঞরা।

সুস্বাস্থ্য

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে বেদানা খান

পরিমল রায় চৌধুরী

বেদানা গাছের প্রথম উৎপত্তি পারস্য ও আফগানিস্থানে। বর্তমানে ভারত, আরব, আমেরিকা, মেক্সিকো ও আফ্রিকাতেও বেদানার চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু ডালিম নামক বেদানার প্রায় সমগোত্রীয় ফলের গাছের উল্লেখ ভারতীয় বিভিন্ন পুরাণে রয়েছে। এর গুণাগুণের ব্যাপকতাকে আধ্যাত্মিক রসে সিঞ্চিত করে দেবী রক্তদন্তিকা মাতার নামের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। দুর্গা পূজায় যে নবপত্রিকা রচনা করা হয়, তাতে ডালিম ডাল দেওয়া হয়। আর পূজার সময় ডালিম অধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা নামে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। বেদানা গাছটি ছোট আকারের, এর পাতাগুলি খুব চকচকে ও ফুলগুলি খুবই সুন্দর হয়। বেদানা ফলটি আপেলের সাইজের মতো হয় এবং এর খোসাটি খুব শক্ত। বেদানার রস সাধারণত মিষ্টি হয়ে থাকে।

বেদানা ও বেদানার রস

একটু বড় সাইজের বেদানা মিষ্ট ও সুস্বাদু হয়। বেদানা ফলটি অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে, বিশেষ করে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দিলে প্রায় ছয় মাস তাজা থাকে। সাধারণত এই ফলটি পাকা অবস্থার আগেই গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া হয়, রেখে দিলে ধীরে ধীরে পেকে যায়।

দেখা গেছে, বেদানা ফলে জল থাকে ৭৮%; প্রোটিন ১.৬%; ফাইবার থাকে ৫.১%; কার্বোহাইড্রেট ১৪.৬%; সুগার ১২% থেকে ১৬% এবং কিছু ক্যালসিয়ামও থাকে। শুধু তাই নয়, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস ও জিঙ্ক দ্বারা ডালিম সমৃদ্ধ।

বেদানার রস শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী; যে কোনো ধরনের জ্বর হলে এর রস খাওয়া খুব ভালো। বেদানা বা বেদানার রস হার্টের রোগীদের ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ দেয়। ছোটদের জন্য এই ফলটি টনিকের মতো কাজ করে। বেদানার রসে অল্প পরিমাণ জল ও চিনি মিশিয়ে এটি সুস্বাদু সরবত্ হিসেবে পান করা যায়। বেদানার রস আইসক্রিমেও ব্যবহার করা যায়। এই ফলটির একটি বিশেষ গুণ হলো, এটি যেকোনো ফলের থেকে সহজেই হজম হয়ে যায়।

বেদানার বিশেষ বিশেষ কয়েকটি গুণ ঃ

১) বেদানা একটি ভালো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।

২) বেদানার রসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'C' থাকে—যেটা শরীরের জন্য খুবই ভালো।

৩) চিকিৎসকদের মতে, প্রস্টেট রোগীদের জন্য নিয়মিত বেদানার রস পান করা খুব উপকারী।

৪) কোলাইটিস রোগীদের জন্য বেদানার রস পান করা অত্যন্ত উপকারী।

৫) চিকিৎসকদের মতে, হার্টের রোগীদের জন্য বেদানার রস পান করা খুবই ভালো। এটি হার্ট ও ধমনীকে রক্ষা করে।

৬) রক্তচাপ কমাতে বেদানার রস খুব উপকারী।

৭) ডালিম ডায়াবেটিস রুগি-দের শক্তিবর্ধক মিষ্টি হলেও ক্ষতিকারক নয়।

৮) এটি ক্যান্সার প্রতিরোধকারী।

৯) ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-সি, সাইট্রিক অ্যাসিড ও ট্যানিন-সমৃদ্ধ হওয়ায় ত্বকের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১০) অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকার ফলে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। দাঁতে প্লাক জমতে বাধা দেয়।

১১) ফাংগাস ইনফেকশনের বিরুদ্ধেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বেদানা উপকারী তো বটেই কিন্তু কিছু বিশেষ রুগি আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বেদানাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। যেমন, কম রক্তচাপযুক্ত মানুষ, মানসিক রোগে নিয়মিত ঔষধ-সেবনকারী মানুষ, সর্দি-কাশিতে যারা খুব ভোগেন—তাঁরা এবং অ্যালার্জিতে জর্জরিত মানুষজন।

কখন খাবেন ঃ বিশেষজ্ঞদের মতে, ফল নিজে চিবিয়ে খাওয়াই উচিত। মূল খাবার ও ফল খাওয়ার মধ্যে অন্তত আধ-ঘণ্টা ফাঁক থাকা বাঞ্ছনীয়। ডায়াবেটিস রুগিদের ক্ষেত্রে এই ফাঁক অন্তত ২ ঘণ্টা হওয়াই জরুরি। তবে সকালে খালি পেটে জল ও ফল রাখা শরীরের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী।

অতএব শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য বেদানা ফলটি অত্যন্ত উপকারী।

দত্ত বাড়ির ছেলে

বদ্রীনাথ পাল

দত্ত বাড়ির ছেলে—
নামটি ছিল 'বিলে',
খেলার সাথী সবাই তাকেই
মাথায় করে নিলে!

সকাল, সন্ধ্যা বেলা—
হতো ধ্যানের খেলা,
চোখ মিট্‌মিট্ করতো সবাই
সঙ্গী যতো চেলা।

সময় হতো পার—
হুঁশ থাকে না তার,
ভাঙতো সে ধ্যান শুনতো যখন
ডাকটি আপন মা'র।

বলতো সকল লোকে—
'দেখবি না যা চোখে,
বিশ্বাস নেই আদৌ সেটার
তুচ্ছ করিস তাকে।'

বড্ড সে একগুঁয়ে—
থাকতো নাকো নুয়ে,
বলতো 'যদি ঠাকুর আছে—
তা আছে এই ভুঁয়ে।'

বিশ্ব চেনে যাকে—
চিনলে এবার তাকে?
সেই ছেলে যে 'বিবেকানন্দ'
হৃদয় মাঝে থাকে।

অনন্য বীর

বিকাশ পণ্ডিত

অনন্য বীর নেতাজী সুভাষ,
মুক্তিপথের অগ্রদূত।
'পথের দাবী'র সব্যসাচী
ছদ্মবেশে নেই তো খুঁত।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী
উদ্বেলিত হৃদয়তন্ত্রে;
পরাধীনতার হীনতার গ্লানি
মুছিয়ে দিতে স্বদেশমন্ত্রে।
শাসকের চোখে ধুলো দিয়ে তুমি
বার্লিন হয়ে সিঙ্গাপুর;
গড়েছো ফৌজ আজাদ হিন্দ
সহস্র স্বপ্নে ভরপুর।
অনন্য বীর নেতাজী সুভাষ
আজও রয়েছ হৃদয়ে আমার।
তোমার ত্যাগ আদর্শ, সংগ্রাম
দিশারি হোক জীবনে সবার।

শীত এলো

ছড়ানন্দ ব্রহ্মচারী

শরৎ-বাদল পাল্টে আদল, এলো এবার শীত,
পূবের হাওয়ার ফিরে যাওয়া, উত্তুরের গীত।
ভরবে মাঠ হরেক মেলায়, ক্রিকেট খেলায়, সার্কাসে-
চিড়িয়াখানায় আনাগোনায়, পাখির ভিড়ে, ফিস্‌ফাসে।
হৈ হৈ মাতি চড়ুইভাতি, বনের ধারে করছে কারা?
শীতের খবর, সুখের খবর, পিঠে-পায়েসে ভরা।
এবার পুজো হলো কিন্তু ভয়-তরাসে ভিড়ভাট্টাহীন,
করোনা ভাইরাস অতিমারী সন্ত্রাস, করলো জীবন সঙ্গিন।
কালীপুজো দেওয়ালী রাত, বাজি-ফাট্‌কায় হতো মাত্—
হাইকোর্টের নিষেধ তাতে, হৈ হৈ করা নয় একসাথে।
তবে কি শীতে মেলা-খেলা, হবেও না চড়ুইভাতি?
করোনা অসুরই জিতে যাবে? গুটিয়ে নেবে নরদেবতা ছাতি?
না বন্ধু নয়, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো, মৃত্যু করো জয়।
দৈহিক দূরত্ব রণকৌশল শুধু, জেনো মনের দূরত্ব নয়।

কালীর কাণ্ড

রণজয় গাঙ্গুলী

হে মা কালী, তোমায় বলি
একি তোমার কাণ্ড!
রক্ত মাখি, হাতে অসি
গলায় তোমার মুণ্ড!
এলোকেশী, অট্টহাসি
যাচ্ছ কোথায়? রোসো।
দেখো চেয়ে, নীচের দিকে
কারে পায়ের তলে পেশো।
আহা! শিব বেচারা তোমার ভারে
শব হয়েছে যেন।
জিভ বাড়িয়ে, মুখ রাঙিয়ে
এখন লজ্জা পেলে কেন?
যা হোক বাপু, যা হয়েছে,
এবার সাবধানেতে থেকো
ভক্ত তোমার এই রূপেতেই
পূজবে জেনে রেখো।
বললাম বলে রাগ করো না,
ভয় দেখিয়ো না যেন!
আমরা শিশু, তোমার কোলের
এটা তো তুমি মানো?

কুইজ

তুমি কি জানো? — কুইজ মাস্টার

১. চাষ জমিতে খুরপি দিয়ে, না নিড়েন দিয়ে কাজ করতে সুবিধা?
ক) খুরপি দিয়ে খ) নিড়েন দিয়ে গ) এর কোনোটাই নয়

২. ধূমপায়ীগণের শীতকালে হাত-পা ফাটা রোগ কম হয় কেন?
ক) তামাক জীবাণু নষ্ট করে খ) ধূমপানে সতেজতা আনে গ) তামাকের মধ্যে রেচক ক্ষমতা আছে

৩. চাষীদের হাতে-কলমে শেখার সময় কোনটি?
ক) ফসল লাগাবার আগে খ) ফসল লাগাবার পরে গ) ফসল লাগাবার সময়

৪. প্রোজেক্টের টাকা সরকার দেবে অথবা ভক্তরা দেবে। গ্রামকর্মিরা কি দেবে?
ক) লেকচার দেবে খ) শ্রম দেবে গ) ভালোবাসা দেবে

৫. মসুরি গাছের ফসলে গাছটির গোড়ায় শক্ত দানাটির কাজ কি?
ক) অক্সিজেন সংগ্রহ করে খ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয় গ) বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে

৬. আউশ ধান উঠে গেলে কোন ফসল লাগানো লাভজনক?
ক) বোরো ধান খ) আখ-আলু-কপির চাষ গ) সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ চাষ

৭. ভক্তেরা কোন জাত?
ক) বামুন খ) যাদের পয়সা আছে গ) কোনো জাত নেই

৮. হাত-পাখা তৈরির সময় পাতাটা জলে ভেজাব কেন?
ক) জলে ভেজালে পাতাটা শক্ত হয়
খ) জলে ভেজালে পাতাটা নরম হয়
গ) জলে ভেজালে ডাঁট লাগাতে সুবিধা হয়

৯. আমরা যা পেয়েছি তাতে সন্তুষ্ট নই কেন?
ক) প্রাপ্তির মূল্য বুঝি না খ) নিজের ওজন বুঝি না গ) প্রলোভন, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও লোভের জন্য

১০. গরুর শিং দেখে কি করে বুঝব ভালো গরু?
ক) শিং-দুটি সমান ও সমান্তরাল হবে
খ) যখন শিং-দুটো অসমান হবে
গ) শিং-দুটো মাথার ভেতরের দিকে ঢুকে থাকবে

ধাঁধা — রীনা রানী দাস

১) জ্বলে কিন্তু পোড়ে না
কোন সে প্রাণী বলো তা?

২) গরম নয় ঠাণ্ডাও নয়, কিন্তু আমরা ফুঁ দিয়ে খাই।
বলো জিনিসটা কি হবে?

৩) একটুখানি জলে মাছ কিলবিল করে
কোনো জনের সাধ্য নেই হাত দিয়ে তাদের ধরে।

৪) জলের জীব নয়, জলেতে বাস করে
হাত নেই পা নেই, তবু সাঁতার কাটে।

৫) কোন ফলের ওপরটা আমরা খাই, ভিতরে তার ফুল,
ভাবতে গেলে বড় বড় পণ্ডিতের হয় ভুল।

৬) তিন অক্ষরের নাম তার জন্ম তার মাটির নীচে,
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে ফল হয়ে গাছে ঝুলে থাকে।

৭) ঢাকাতে আছে কিন্তু বাংলাদেশে নেই, কলকাতায় আছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নেই। বলুন উত্তরটা কী হবে?

৮) হাত দিলে বন্ধ হয়, সূর্য ডুবলে খোলে
ঘোমটা দেওয়া স্বভাব তার মুখ নাই তোলে।

৯) কোন ফুল ফোটে না, তবুও তাকে আমরা খুব সুন্দর ফুল বলে থাকি?

১০) কোন জিনিস হসপিটালের বাইরে ফ্রিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হসপিটালে টাকা দিয়ে কিনতে হয়?

১১) বলুন তো কোন জিনিস ডোবে কিন্তু ভেজে না।

১২) পাতা আছে গাছ নেই, তারা আছে আকাশ নেই,
জল আছে মেঘ নেই, বলুন তো জিনিসটা কি হবে?

গত ডিসেম্বর ২০২১ সংখ্যা-র কুইজ ও ধাঁধার সমাধান

কুইজ-এর সমাধান ঃ ১.গ) শিহড় ২.গ) তারকনাথ ঘোষাল ৩.ক) মাতা মেরী ৪.খ) শ্যামাসুন্দরী ৫.গ) খেজুর ৬.খ) ইভ রাত্রিতে সন্ন্যাস গ্রহণের শপথ গ্রহণ ৭.গ) ঘুঁটের স্তূপ ৪টি ও সূর্য ৮.ক) নস্যি ৯.গ) আমোদর ১০.খ) সুরবালা দেবী ১১.গ) শরৎ মহারাজ ১২.খ) জগদ্ধাত্রী।

ধাঁধার সমাধান ঃ ১) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ২) ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ৩) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ৪) দক্ষিণেশ্বরে ৫) ভুবনেশ্বরী দেবী ৬) স্বামী বিবেকানন্দ ৭) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ৮) স্বামী বিবেকানন্দ ৯) স্বামী বিবেকানন্দ ১০) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী।

আশ্রম সংবাদ

স্বামী কেদারানন্দজী রামকৃষ্ণলোকে

গত ২৬ অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুরের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী কেদারানন্দজী সজ্ঞানে সচেতনভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে লীন হলেন। শরীর ত্যাগের সময় তাঁর

বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। স্বামী মাধবানন্দজীর মন্ত্রদীক্ষিত এই সন্ন্যাসী ১৯৬৬ সালে মিশনের মুম্বাই কেন্দ্রে সঙ্ঘে যোগদান করেন। সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর নিকট থেকে। মুম্বাই–এর পর নরেন্দ্রপুরে তিনি দীর্ঘদিন সেবক হিসাবে ছিলেন। সহসম্পাদকের কাজে বৃত হয়ে নরেন্দ্রপুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। দিল্লী কেন্দ্রে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর কানপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রধান হিসাবে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে সেবা দান করেন। ২০১২ সাল থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সক্রিয় সেবাদানের থেকে বিরত হয়ে সাধন–ভজনে দিনাতিপাত করতে থাকেন। তাঁর শান্ত, সৌম্য স্বভাবের জন্য সকল সাধু–ব্রহ্মচারী ও ভক্তমহলে তিনি সমাদৃত ছিলেন।

ফুড প্রসেসিং ইউনিটের স্থানান্তরকরণ

গত ২৬ নভেম্বর ২০২১, শুক্রবার বিকাল ৪.৩০টায় রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুরের ফুড প্রসেসিং

ইউনিটটি গদাধর ভবন থেকে বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি তথা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আই.আর.ডি.এম ফ্যাকাল্টি অর্থাৎ ইনট্রিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করা হলো। উদ্দেশ্য এই ফ্যাকাল্টি Post Harvest Technology Dissemination Centre–এর সহযোগিতায় আরো নূতন ধরনের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা।

ইনস্টিটিউটের প্রো–চ্যান্সেলার স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ আশ্রমের প্রায় সকল সন্ন্যাসির (৩২ জন) উপস্থিতিতে এই খাদ্য উৎপাদন ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে অর্ঘ্যদান ও আরতি করে এই শুভ কাজটি সুসম্পন্ন করা হয়। উপস্থিত সকল কর্মী, ছাত্রছাত্রী ও সুধীজনকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

গোবর–গ্যাস প্ল্যান্টের উদ্বোধন—বায়ো মিথানেশন প্ল্যান্ট এনার্জি বিন–১০০০

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় জিয়ন ওয়েস্ট ম্যানেজারস্ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পরিচালনায় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুরে একটি বৃহৎ গোবর–গ্যাস প্ল্যান্টের উদ্বোধন করা হলো। প্রতিদিন ৭৫০

কেজি গোবর ও ২৫০ কেজি রন্ধনজাত আবর্জনা অর্থাৎ ১০০০ কেজি বর্জ্য পদার্থের গ্যাস উৎপন্ন হবে।

গত ২৮ নভেম্বর ২০২১, রবিবার জাতীয় সবুজ ন্যায়পীঠ (National Green Tribunal)–এর চেয়ার পার্সন ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় পীযূষ গোয়েল মহাশয় প্ল্যান্টটির যথাযথ স্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণের তদারকির উদ্বোধন করলেন।

এই গ্যাসের প্ল্যান্টটি থেকে আশ্রম রন্ধনাগারের প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

পরিষদ সংবাদ

৪৭তম সংস্থা সচিব সম্মেলন, ২০২১

প্রত্যয় রায়চৌধুরী

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শ্রীমা সারদা হলে ২৬ নভেম্বর ২০২১ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৪৭তম সংস্থা সচিব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সারা বছর ধরে যে সেবাকাজ চলে, তার মূল্যায়নই ছিল এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনে এই রাজ্যের ১০টি জেলা থেকে ২৪৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যন্ত গ্রামে স্বামীজীর কাজ করে যে ক্লাব সংগঠনগুলি তাদের এবং গুচ্ছ সমিতিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ এসে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সম্মেলনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলেন। বিগত বছরগুলিতে গ্রাম উন্নয়নের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলির মূল্যায়ন করা এবং আগামী বছরের কাজের একটি রূপরেখা তৈরি করা ছিল এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন

প্রথম দিন বিকাল ৫টার সময় বেদমন্ত্র উচ্চারণ, প্রদীপ প্রজ্বলন এবং মঙ্গল ধ্বনির মধ্য দিয়ে ৪৭তম সচিব সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ, প্রো-চ্যান্সেলর, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ডিমড্ ইউনিভারসিটি), বেলুড় মঠ, হাওড়া। এরপর উপস্থিত সন্ন্যাসিবৃন্দ ঠাকুর-মা-স্বামীজীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। এরপর 'সারদা হলে' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুরের স্বামী পূর্ণময়ানন্দ। আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী সর্বলোকানন্দ মহারাজ স্বাগত ভাষণে সকল প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, গত বছরে মহামারীর কারণে সংস্থা সচিব সম্মেলন স্থগিত ছিল। এবছরও সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে। মহারাজ বলেন ১৯৭০ সাল থেকে গ্রামোন্নয়নের চিন্তাভাবনা শুরু হয় এবং পরিকাঠামো নির্ধারিত হয়। গুচ্ছ সমিতির সৃষ্টির মাধ্যমে জেলাগুলিতে গ্রামের কাজ শুরু হয়। স্বামীজীর ভাবধারা অনুযায়ী গ্রামের মানুষকে উন্নত করে, শিক্ষিত করে নিজের পায়ে দাঁড় করানোই মূল লক্ষ্য। মহারাজ বলেন, বিগত ৫০ বছর ধরে লোকশিক্ষা পরিষদ মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছে। সফলতার নিদর্শন হিসাবে অযোধ্যা পাহাড়ের গো-পালন প্রশিক্ষণ ও সাঁতুড়ি মটগোদার স্থায়ী প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন মহারাজ। ভারতের নারী জাগরণে মা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতার অবদানের কথা মহারাজ স্মরণ করেন। তিনি বলেন মা নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'তোমার স্কুলে একদিন অনেক মেয়ে আসবে।' তিনি লেডি ডাফরিন কলেজে সরলাদেবীকে নার্সিং ট্রেনিং-এর জন্য পাঠিয়েছিলেন। নারী সশক্তিকরণে মায়ের ভূমিকার অসামান্যতার উল্লেখ করেন মহারাজ।

সচিব সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন

এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বামুনমোড়ার অধ্যক্ষ স্বামী দুর্গাত্মানন্দ তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি অতীতের স্মৃতি আলোচনা করতে গিয়ে আশ্রম রূপকার ব্রহ্মলীন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর স্মৃতিচারণ করেন। বলেন, মহারাজ জাতি-ধর্মের কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তিনি মানুষের মধ্যে নারায়ণকে দর্শন করতেন। হিসাবপত্র স্বচ্ছ রাখার ওপর তিনি জোর দিতেন।

মহারাজ বলেন, নারীকে মর্যাদা দেওয়া—মা নিজের জীবন দিয়ে শিখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, নারীশক্তিকে

জাগরিত করতে হলে মায়ের শক্তিতেই সেই জাগরণ ঘটবে। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী পবিত্রচিত্তানন্দ। সভাপতির ভাষণে স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ সভার মূল আলোচ্য বিষয় 'নারী জাগরণে শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা'র ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, আত্মত্যাগ না করলে কোনো নারী শক্তির অধিকারী হয় না। সশক্তিকরণ হলো শক্তির জাগরণ। তিনি আরো বলেন—বাহুবল, বুদ্ধিবল ও আত্মবলের মধ্যে যার আত্মবল আছে, সেই শ্রেষ্ঠ। মায়ের মধ্যে মৃদুতা, লজ্জাশীলতা ও চপলতার রাশ—এই তিন গুণ ছিল। তাঁর যে কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ঠাকুর মায়ের কাছে সমস্ত সমর্পণ করে নারীশক্তিকে জাগরিত করেছিলেন।

'মা ও শিশু বিকাশ' অধিবেশন

উদ্বোধনী অধিবেশনের শেষ লগ্নে দুই জন গ্রামকর্মী নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। প্রথম গ্রামকর্মী পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামমঙ্গল গুচ্ছ সমিতির কবিতা মিদ্যা বলেন, তাঁর এলাকায় পরিষদের মাধ্যমে ২১৭ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হয়েছে। জরায়ু ক্যান্সারে ক্যাম্পে ১৬৫ জন যোগদান করেছে। দ্বিতীয় গ্রামকর্মী মুর্শিদাবাদের সুজিত কুমার হালদারও তাঁর সুবিধা-অসুবিধার কথা জানান। শেষে আশ্রমের সহাধ্যক্ষ স্বামী দেবেশ্বরানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং গোবিন্দ দেবনাথের সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারী তুরীয়চৈতন্য সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

পরদিন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রারম্ভে 'সুপ্রভাতম্' স্তোত্রপাঠ করেন স্বামী পূর্ণময়ানন্দ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ।

সকাল ৯টায় 'মা ও শিশু বিকাশ' কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সভার শুরুতে সীতানাথ ত্রিপাঠি সকলকে শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানান। এরপর হিরণ্ময় দত্ত বলেন, মা ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচী তিনটি বিভাগে কাজ করে—ভিসিডিপি, চলমান বাহিনী ও আইসিডিএস। স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ তাঁর বিশেষ অতিথির ভাষণে বলেন, সর্বভারতীয় কোঠারী কমিশন গর্ভবতী মায়েদের যত্নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুর পুষ্টি মাতৃগর্ভে শুরু হয়। শিশুর পুষ্টির সাথে সাথে তাদের মানসিক পুষ্টির দিকেও নজর দিতে হবে। মুখ্য আলোচক শিবানী হালদার বলেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলায় ১২৩টি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র আছে, যেখানে বিবেকানন্দ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের পরিচালনায় ৫০০০ জন শিশুকে যত্নসহকারে শিক্ষাদান করা হয়।

আশ্রম সম্পাদক মহারাজ জানান, ১৯৮৬ সাল থেকে আশ্রমের পরিচালনায় ১৭টি গুচ্ছ সমিতির মাধ্যমে ১৩২টি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে। কিছু কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নতমানের নেই, তিনি লোকশিক্ষা পরিষদের প্রতিনিধিদের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করার কথা বলেন। অপর আলোচক মিহির বসু বলেন, চলমান বাহিনী কর্মসূচীর ৬৫ বছর অতিক্রান্ত হলো। প্রথমে তিনটি বিভাগের কর্মসূচীর মাধ্যমে এই চলমান বাহিনীর কর্মসূচী শুরু হয়। (১) বয়স্ক শিক্ষা বিভাগ, (২) বয়ঃসন্ধিকালীন শিশুদের বিকাশ, (৩) শরীরচর্চা এবং প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। তিনি বলেন, কিশোর-কিশোরীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য ৭ দিনের একটি ট্রেনিং ক্যাম্প বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত করা হয়েছে।

'জৈব কৃষি' অধিবেশন

বড়তলা আই.সি.ডি.এস প্রকল্পের পাপড়ি রায় বলেন, ১২৫টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,৬৯৩ জন গ্রহীতাকে (গর্ভবতী/প্রসূতি এবং শিশুদের) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক পরিষেবা চালু আছে। সিদ্ধান্ত হয়, প্রতিটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে

শৌচাগার ও পানীয় জলের যথাযথ ব্যবস্থা যাতে হয়, তার জন্য সংগঠনগুলিকে উদ্যোগী হতে হবে। গুচ্ছ সমিতিগুলিকে গ্রামসংগঠনের মাধ্যমে নতুন শিশুশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। সর্বশেষে স্বামী নীরজানন্দ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল 'জৈব কৃষি'। সঞ্চালক ছিলেন ডঃ সুভাষ আদক, এবং উপস্থাপক ছিলেন মানস ঘোষ। অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, মাননীয় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি বিভাগের অতিরিক্ত অধিকর্তা স্বপন শাসমল। মুখ্য আলোচক ডঃ সৌরেন্দ্রনাথ দাস বলেন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব, ফসলের পরিচর্যা, দেশীয় বীজ, জৈব বীজ, জৈব সার, জীবাণু সার, কেঁচো সার, সবুজ সার ইত্যাদির ব্যবহার সুনিশ্চিত করা আমাদের আশু কর্তব্য। মাননীয় মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক পুস্তকাদি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

'কারিগরি প্রশিক্ষণ' অধিবেশন

তৃতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল কারিগরি প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা সৃষ্টি—পরিষদের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড। উপস্থাপক স্বামী সুরনাথানন্দ বলেন, ১৯৫৬ সালে বয়স্ক শিক্ষা ও চলমান বাহিনীর মাধ্যমে লোকশিক্ষা পরিষদের কর্মকাণ্ডের সূচনা এবং ১৯৭৯ সালে ৫ রকম কারিগরি প্রশিক্ষণ থেকে বর্তমানে ৩২ রকমের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হা কিভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারা সম্ভব, তার উপর আলোকপাত করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দেন। অধিবেশনে আলোচক হিসাবে সুব্রত গাঙ্গুলী তাঁর আলোচনায় সরকার ও মিশনের যৌথ উদ্যোগের উপর বেশি জোর দেন। অংশুমান দাস, ডব্লু.এইচ.এইচ. প্রোগ্রাম অফিসার চাহিদা ও সম্পদের নিরিখে প্রশিক্ষণের বিষয় তৈরি ও তার পরিচালন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী বাসবানন্দ বাজার প্রতিযোগিতার দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি আগত প্রতিনিধিদের বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এবং মাছ শিল্পের উদাহরণ দিয়ে উৎসাহিত করেন। অধিবেশনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী নন্দীশানন্দ এবং অধিবেশনে সঞ্চালনা করেন লোকশিক্ষা পরিষদের অভিজিৎ নট্ট। অধিবেশনে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের স্বনির্ভর করার জন্য EDP, GOWB-এর সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ proposal তাঁর দপ্তরে পাঠানো হলে, তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

চতুর্থ অধিবেশনে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। অধিবেশনের শুরুতে সঞ্চালক চণ্ডীচরণ দে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ কলুষিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর জীবকুল সঙ্কটের মুখে। ডঃ দীপাঞ্জন মৌলিক, সিনিয়র পরিবেশ ইঞ্জিনিয়র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা যে বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে, তার উল্লেখ করেন। একই সাথে মানুষের খাদ্যের সংস্থানের জন্য যে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যয় হচ্ছে তার বিপদের কথা বিশদে ব্যাখ্যা করেন। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জল সংরক্ষণের গুরুত্বও তিনি আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বিশেষ সচিব, শুক্তিষিক্তা ভট্টাচার্য ওয়াটার শেড তৈরির মাধ্যমে কিভাবে লবণাক্ত ও অনুর্বর জায়গায় কৃষিকাজ গতি পেয়েছে তার বিবরণ দেন। তিনি শুকিয়ে যাওয়া নদীকে পুনরায় বহমান করতে সরকারি ঝরনাধারা প্রকল্পের উল্লেখ করেন।

দর্শকাসনে সন্ন্যাসিদের মেলা

পঞ্চম অধিবেশনের বিষয় ছিল স্বচ্ছ ভারত মিশন বা মিশন নির্মল বাংলা, সঞ্চালক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বপন কুমার ঘোড়ুই। অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এম. ভি. রাও গুগুল মিটে বলেন—জনসচেতনতা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। স্বাস্থ্যবিধানের সঙ্গে জল সরবরাহ এখনো হয়ে উঠেনি। লোকশিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত গ্রাম সংগঠনগুলোকে নিয়ে Instrument of Farmer Producer Company খোলার পরিকল্পনা করতে হবে। উপস্থাপক চণ্ডীচরণ দে বলেন, ২৩টি গুচ্ছ সমিতির মাধ্যমে কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। মিশন নির্মল বাংলা, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য সংযোজক পার্থ চক্রবর্তী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, কঠিন ও তরল বর্জ্য সংরক্ষণের উপর সচেতনতা তৈরি করতে হবে। 3R অর্থাৎ Refuse, Reuse এবং Recycle পদ্ধতি অবলম্বন করে Waste Management করা যাবে। তিনি বলেন, বাড়িতে তিন ধরনের বিন (পচনশীল, অপচনশীল ও রিসাইকেল) ব্যবহার করতে হবে। বর্জ্য প্লাস্টিক রাস্তার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গুচ্ছ সমিতির সংগঠন অধিবেশন

ষষ্ঠ অধিবেশনে গুচ্ছ সমিতি/সংগঠনের সংবিধানের কার্য প্রণালী বিষয়ে আলোচনা হয়। সঞ্চালক ছিলেন মহাদেব মাইতি এবং উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্মল কুমার পট্টনায়ক। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, Memorandum of Association–এ গুচ্ছ সমিতিগুলিকে অবশ্যই লোকশিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লেখ করতে হবে এবং লোকশিক্ষা পরিষদের ভাবাদর্শে পরিচালিত হতে হবে। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন স্বামী সর্বলোকানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, প্রতিটি গুচ্ছ সমিতি একটি অছি পরিষদ করে তাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য কাজ করবে। নিয়মাবলী অংশে সদস্যের ব্যাপারে একটি সমতা আনতে হবে। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র প্রামাণিক ও প্রধান অতিথি ছিলেন বিমান পান্থি। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ।

সপ্তম অধিবেশনে ভাবানুশীলন নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথম আলোচক স্বামী তৎপরানন্দ বলেন, শিব জ্ঞানে জীব সেবাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। অপর আলোচক স্বামী কমলাসনানন্দ বলেন, মানুষের জন্য কাজ শুধু অর্থ দিয়ে হয় না, ঈশ্বরের কাছে তাদের মঙ্গল কামনা করাও একটি সেবা কাজ। আমাদের অন্যের সুখ–দুঃখের অংশীদার হতে হবে। মুখ্য আলোচক স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ বলেন, গ্রামের কাজ করতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণকে জানা খুব প্রয়োজন এবং তাঁর সাথে আমাদের ও কাজের কী সম্পর্ক তাও ভালোভাবে জানতে হবে। তিনি সেন্ট লরেন্স–এর গল্পের আশ্রয়ে সেবা কার্যের ব্যাখ্যা করেন। কোনো কাজ বা দায়িত্ব কারোর উপর অর্পিত হলে, সে দায়িত্ব যতই কঠিন হোক না কেন, তাকে না এড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, তিনি যেন সফল হতে সাহায্য করেন। কর্মের সাফল্য ও গৌরবকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হবে। সভাপতি স্বামী সন্দর্শনানন্দ বলেন, গ্রাম সংগঠনের কাজে সংগঠকদের হৃদয়ের প্রসারতার প্রয়োজন। জাত–ধর্মের উর্ধ্বে উঠে সমন্বয় সাধন করতে পারলে কর্মে সফলতা আসবে। সংগঠনের বিভিন্ন ঘাত–প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতার সময় সংহতি খুবই প্রয়োজন। সঞ্চালক ছিলেন প্রত্যয় রায়চৌধুরী।

ভাবানুশীলন অধিবেশন

সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে গ্রাম সংগঠকদের গুচ্ছ সমিতি–ভিত্তিক গোষ্ঠী–আলোচনা হয়। নবম অধিবেশনে সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আশ্রম অধ্যক্ষ মহারাজ সকল গ্রামসংগঠন ও গুচ্ছ সমিতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বৃদ্ধির কথা বলেন এবং লোকশিক্ষা পরিষদ ও গুচ্ছ সমিতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর জোর দেন। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চণ্ডীচরণ দে।

খেলা

সর্বকালের সেরা টাইগার

সায়ন্তন দাস

অনেকেই হয়তো জানেন না যে পটৌডি কোনও ব্যক্তি নন। এটি একটি জায়গার নাম। পটৌডি হরিয়ানার একটি জনপদ, মানুষ সেখানে হাতে গোনা। ১৮০৪ সাল থেকে পটৌডিতে নবাবের শাসন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মরাঠা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ফৈয়াজ তালাব খানকে এই সম্পত্তি উপহার দেওয়া হয়েছিল।

ইফতিকার আলি খান পটৌডি ছিলেন মনসুরের পিতা। তিনি ছিলেন অষ্টম নবাব। তিনিও ছিলেন ব্যাটসম্যান। ইফতিকার আলি খান পটৌডি ইংল্যাণ্ড ও ভারতের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। পরবর্তিকালে তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়কও হন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি লাভের পর, পটৌডি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ হয়ে ওঠে। দেশ ভাগ হওয়ার পর অনেকে পাকিস্তান চলে গেলেও ইফতিকার আলি খান কিন্তু ভারত ছাড়েননি।

মনসুর আলি খান পটৌডি (টাইগার)

এবার আসা যাক টাইগারের কথায়। ঠিক ধরেছেন, আমাদের দেশের অন্যতম সেরা অধিনায়ক মনসুর আলি খান। সালটা ১৯৬২। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এসেছে ভারত সফরে। তখন ভারতের অধিনায়ক নরি কন্ট্রাক্টর। সহ-অধিনায়ক মনসুর আলি খান। সদ্য চোখ-দুর্ঘটনা থেকে উঠে এসেছেন। বয়স তখন একুশ।

চার্লি গিফিথের বল কন্ট্রাক্টরের মাথায় লাগে। সেই শব্দ ড্রেসিংরুম থেকেও নাকি শোনা গিয়েছিল। এই ঘটনার পরই টাইগারকে অধিনায়ক হতে হয়। সেই সিরিজে মনে রাখার মতো কিছুই করেননি তিনি। পরে ক্লাইভ লয়েডের অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতে আসে। প্রথম দুটি টেস্ট জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চালকের আসনে। ১৯৭৪-এর ২৭ ডিসেম্বর। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে তৃতীয় টেস্ট। অ্যান্ডি রবার্টসের বাউন্সারে চোয়ালের হাড় ভেঙে যায় পটৌডির। যত যাই হোক ভারত সেই টেস্ট ৮৫ রানে জেতে। এই প্রসঙ্গে পটৌডি তাঁর মেয়ে সোহা আলি খানকে বলেছিলেন, 'আমার এক চোখের দৃষ্টি গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজের লক্ষ্য থেকে আমার নজর কখনো সরেনি।'

পটৌডির অধিনায়কত্বে ভারত প্রথমবার বিদেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জেতে। ১৯৬৭-৬৮ সালে নিউজিল্যাণ্ডকে ৩-১ ব্যবধানে হারায়। তিনিই প্রথমবার ফিল্ডিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম বলে মনে করেন। নিজেও একজন অসাধারণ ফিল্ডার ছিলেন। টাইগারের (বাঘের) মতো তিনিও একটি বলও গলতে দিতেন না। তাঁর ফিল্ডিংয়ের জাদুতে আজও ভারতীয়রা মোহিত হয়ে আছে। আজও তাঁর সেই অসাধারণ ফিল্ডিং আপামর ভারতবাসীর মনের মণিকোঠায় রয়ে গেছে। মিহির বোস তাঁর বই 'A History of Indian Cricket'-এ লিখছেন, 'To a nation that for 20 years regarded a draw as a victory and whose cricket had a certain predictability, he brought the prospect of victory, often unexpected victories, and his captaincy had an element of daring, at times maddeningly unpredictable, so that even when India failed the impression was of having attempted the impossible.'

এবার আসা যাক টাইগার ও শর্মিলা ঠাকুরের গল্পে। শর্মিলা এক সাক্ষাৎকারে বলছেন, 'আমাদের গল্পের মধ্যে আহামরি কিছু তো নেই। দেখা হতে ভালো লেগেছিল প্রথমেই।' তিনি আরও বলেন হিন্দু-মুসলমান এসব চিন্তা কোনোদিন মাথায় উঁকিও দেয়নি। শর্মিলা ঠাকুর বলেন যে, টাইগার কোনোদিন তাঁর কেরিয়ার নিয়ে নাক গলাননি।

২০১১ সালের ৫ জানুয়ারি শেষবার টাইগার তাঁর পরিবারের সাথে জন্মদিন পালন করেন। তার আট মাস বাদেই তিনি এক মারাত্মক অসুখের প্রকোপে পড়েন। ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমে আসছিল। ক্রিকেট খেলা যেখানে দৃষ্টির ওপরেই নির্ভরশীল, সেখানে তিনি একটি চোখ ছাড়াই ম্যাজিক দেখিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পরও সেকথা ভাবলে অবাক লাগে। এই জন্যই বোধহয় উনি টাইগার। চোখ বুজেও যে শিকার করতে পারে।

পরিবেশ

জল-সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠুবণ্টন !

হিমাংশু মিস্ত্রি

প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জলেই প্রথম সূচনা হয়। জল ছাড়া কোনো প্রাণীর জীবন ধারণ সম্ভব নয়। প্রতিটি সজীব প্রাণীর শরীরে জলের চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জলের অভাবে জীব যেমন সংকটের সম্মুখীন হয়, তেমনি জলের আধিক্যও সংকট ডেকে আনে। জলজ প্রাণী, জল দূষণ ও জলে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে না পারার জন্য জল সংকটের কবলে পড়ে। আবার অনাবৃষ্টি বা খরা, অতিবৃষ্টি বা বন্যা জল সংকটের অন্যতম কারণ। আলো (উত্তাপ), বাতাস (অক্সিজেন), জল (আর্দ্রতা)—এই তিনটি বিষয় প্রাণ সৃষ্টি ও প্রাণীর প্রাণ ধারণের মূল উপাদান।

জলই জীবন। তাই জল সংকট আগামী বিশ্বে সমগ্র মানবজীবন ও জীবিকার ওপর ভয়ংকর এক অশনি সংকেত। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো জলের অধিকার নিয়ে একদিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে। পৃথিবীর চার ভাগের তিনভাগ জুড়ে শুধুই জল। এই অফুরন্ত জল ভাণ্ডার বা জল সম্পদের মাত্র দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ মানুষের পানের যোগ্য বা সুপেয়। এর মধ্যে শূন্য দশমিক তিন শতাংশ সহজলভ্য—যা ঝরনা, নদী, খাল, বিল ও পুকুরে রয়েছে। মাটির নীচে রয়েছে ত্রিশ দশমিক আট শতাংশ। বাকি আটষট্টি দশমিক নয় শতাংশ তুষার-বরফ হিমবাহ আকারে জমাট বেঁধে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এবং বড় বড় সমুদ্রের মধ্যে।

অনাবৃষ্টিতে মাটি ফুটিফাটা

প্রাচুর্যের মধ্যেই আছে দুর্ভিক্ষের বীজ। মানুষের বাঁচার জন্য খাদ্যের যে প্রয়োজন হয় তার প্রধান উৎস কৃষিজ ফসল। সে কারণেই কৃষিভিত্তিক সভ্যতা, কৃষিভিত্তিক বসতি ভূপৃষ্ঠে সব চাইতে বৈচিত্রময়। কৃষি উৎপাদন অনুসারে বসতি গড়ে ওঠে। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ কৃষিপ্রধান এবং গ্রামীণ। কৃষির পাশাপাশি ঘন বসতি বাড়তে থাকলে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প ও কারিগরি শিল্পও গড়ে ওঠে। যে সকল শিল্প-উৎপাদনের বাজার ভালো, সেই সকল শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বৃহৎ বসতি। তাই শিল্পকে কেন্দ্র করে বড় বড় শিল্প নগরীও গড়ে উঠেছে।

গত শতকে বিশ্বের জনসংখ্যা তিন গুণ বাড়লেও, মানুষের জল ব্যবহার বেড়েছে ছয় গুণ। পৃথিবীর সর্বত্র নিরাপদ পানীয় জলের জন্য মাটির নীচের জল ও ভূপৃষ্ঠের জল—দুইয়ের ব্যবহার অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছে। এজন্য পরিবেশকে অসীম মূল্য দিতে হচ্ছে। বিংশ শতকে বিশ্ব থেকে অর্ধেক জলাভূমি হারিয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বাঁওড়, মজে গেছে বহু নদী। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখে খাদ্যের জোগান দিতে একফসলি জমিকে দোফসলি করা হচ্ছে। এভাবে কৃষিতে জলের ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। ভূ-পৃষ্ঠের জল যেখানে অপ্রতুল, সেখানে ভূগর্ভের জল হয়ে উঠেছে একমাত্র অবলম্বন। নেমে যাচ্ছে জলস্তর, জল পাওয়া যাচ্ছে না নলকূপ থেকেও। দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের সংকট। এর সঙ্গে বিপজ্জনক চেহারা নিচ্ছে দূষণ। কলকারখানার নোংরা জল, বর্জ্য, নালা-নর্দমা বেয়ে এসে পড়ছে নদীতে, দূষিত জলের সঙ্গে বিষাক্ত অ্যাসিড রাসায়নিক। রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মাছ, ব্যাহত হচ্ছে মাছের প্রজনন। ফসলে ব্যবহৃত কীটনাশক, রাসায়নিক সার শোষিত হয়ে চলে যাচ্ছে মাটির নীচে। আর্সেনিক উঠে আসছে নলকূপের পানীয় জলে।

দেশের শিল্পসংস্থাগুলিও প্রয়োজনে জলাধার ও ভূগর্ভ থেকে প্রতিদিন যে হারে জল তুলে নিচ্ছে, তাতে মানুষের পানীয় জল ও ফসল উৎপাদনে সেচের জলের মারাত্মক টান পড়ছে। অন্যদিকে বোতলবন্দী জল-ব্যবসায়ীরাও প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার জল তুলছে মাটির নীচ থেকে। কলকারখানাগুলি যদি পরিত্যক্ত জল শোধন করে পুনরায় ব্যবহার করে, তাহলে জলের কিছুটা সাশ্রয় হয়। সহজ অর্থনীতি বলে, যে জিনিস অনায়াসেই প্রচুর পরিমাণে মেলে, যত প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন, তার দাম সস্তা। জলের ক্ষেত্রে কথাটা খাটতো গত আঠার শতকে, আজকের দিনে 'নৈব নৈব চ'। এই মুহূর্তে এই গ্রহের প্রতি ছয় জনের একজন নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

আমাদের দেশে খরা কবলিত রাজ্যের সংখ্যা আট। তার

মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, ছত্রিশগড়, ওড়িশা, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও উত্তরাঞ্চলের একটি জেলা। জলাভাবী রাজ্যের বেশির ভাগ মহিলারাই ঘাড় ও কোমরে অস্থিসন্ধির নিদারুণ ক্ষয়রোগে ভোগেন। দূর জলের উৎস থেকে জল আনার জন্য গড়ে একজন মহিলাকে বছরে চৌদ্দ হাজার কিলোমিটার হাঁটতে হয়। যেমন তামিলনাড়ুর আভেরিয়াপট্টিনাম, মাহিদির মেয়েদের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন সাংবাদিক পি. সাইনাথ। ওই জায়গার মহিলাদের প্রতিদিন চার ঘণ্টা হাঁটতে হয় এক কলসি জলের জন্য।

পশ্চিমাঞ্চলে বহু দূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ

এই মুহূর্তে বিশ্ব জনসংখ্যার তিন ভাগের প্রায় এক ভাগ মারাত্মক জল সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের 'ওয়ার্ল্ড ওয়াটার অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম'-এর রিপোর্ট বলছে—আগামী কুড়ি বছরে জলের জোগান এক-তৃতীয়াংশ কমবে। দুই হাজার ত্রিশ সালে এই সংকট এমন ভয়াবহ চেহারা নেবে যে, মাথাপিছু জলের চাহিদা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। সে সময় ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য দুই-তৃতীয়াংশ মানুষেরই যথেষ্ট জল থাকবে না। শীঘ্রই জল দুর্লভ পণ্য হিসাবে দেখা দেবে। মুনাফার নজরে 'জল'-ই হবে এই শতকের পেট্রোলিয়াম।

জলকে এতদিন মানবতার সহজাত উত্তরাধিকার বলে বিবেচনা করা হতো। জীবন ও প্রকৃতি—দুই-এর জন্যই জল সমান জরুরি। শুধু মানুষ নয়, গাছপালা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গময় এই গ্রহের অস্তিত্ব নির্ভর করছে পর্যাপ্ত জলের জোগানের ওপর। এই কারণেই জল জনগণের ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি। জলকে বিশ্বব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রসংঘ বলছে 'মানব চাহিদা', বলছে না 'মানব অধিকার'। মানব চাহিদা নানাভাবে জোগান দেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে অর্থের বিনিময়ে। কিন্তু কেউই মানবাধিকার বিক্রি করতে পারে না, পারে না পণ্য হতে। তৃষ্ণা মেটানোর স্বাধীনতা মানুষের অধিকার। গাড়ি, বাড়ি, সম্পত্তি, কোম্পানীর মতো জল মানুষের সৃষ্টি নয়। তাই এটা কখনো মুনাফার লক্ষ্যে পণ্য হতে পারে না। আলো, বাতাসের মতোই জলও প্রকৃতির দান, আমাদের সকলের জন্য।

খাল, পুকুরের জল শোধন করে পানীয় হিসাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা নেই। ফলে আর্সেনিকযুক্ত দূষিত জল খেয়ে মানুষ ডায়েরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের কবলে পড়ছে। দেশের আশি শতাংশ শিশু ভোগে জলবাহিত রোগে, মারা যায় সত্তর শতাংশ শিশু। দূষিত পানীয় জল এখন পৃথিবীর এক নম্বর খুনী। উন্নয়নশীল দেশে সমস্ত অসুখ-বিসুখ ও মৃত্যুর আশি শতাংশের জন্য দায়ী জল। পৃথিবীতে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয় চারশো কোটি মানুষ, এদের মধ্যে বাইশ লক্ষের মৃত্যু হয়। তাদের অধিকাংশই শিশু, বয়স পাঁচ বছরেরও কম। অথচ একটু সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিলে, অন্তত এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে ডায়েরিয়া এড়ানো সম্ভব। কলেরা এখন বিশ্বের জ্বলন্ত সমস্যা। দুই হাজার দুই সালে বিশ্বে এক লক্ষ কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হয়। তার সঙ্গে ম্যালেরিয়া। প্রতি বছর ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়। ছিনিয়ে নেয় দশ লক্ষ শিশুর প্রাণ। আর টাইফয়েডে এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ।

রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জীবন ধারণের জন্য দৈনিক পঞ্চাশ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। পানীয় জল পাঁচ লিটার, কুড়ি লিটার স্যানিটেশন, পনের লিটার স্নানের, দশ লিটার রান্নার জন্য। জলের জোগান যখন ভেঙে পড়ে, গরিব মানুষ তখন অরক্ষিত অথবা দূষিত জলের উৎস ব্যবহার করতে বাধ্য হন। 'জল সংকট' বা 'জল দারিদ্রে'-র শিকার হন প্রধানত গরিব মানুষ, বিশেষত মহিলারা। মা তার সদ্যজাত শিশুকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না নিয়ে গিয়ে অন্য সন্তানের জন্য দূর জলের উৎসে যান। বালিকারা স্কুলে না গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে জলের লম্বা লাইনে।

রাষ্ট্রসংঘের ইউনাইটেড নেশনস্ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ এন ই পি)-এর রিপোর্ট জানাচ্ছে, দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যেই 'জলের তীব্র চাপে'-র মুখে পড়বে ভারত। সেই পরিস্থিতিতে 'জল দুর্ভিক্ষ' বলে চিহ্নিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রকের অনুমান, দুই হাজার পঞ্চাশ সালে ভারতে জল ব্যবহারের সুবিধা কমে দাঁড়াবে সাতশো ষাট ঘনমিটার। আমাদের ভারতবর্ষ অন্যতম বৃষ্টিবহুল দেশ।

(এর পরবর্তী অংশ ৬৭৬ পৃষ্ঠায়)

সমাজশিক্ষণ

সহজপাঠ(২) ও বর্তমান সমাজ

মন্দিরা মহাপাত্র

সামাজিকতা, লোকলৌকিকতা, সংঘবদ্ধতা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা এমনকী সাহসিকতা এক চিরন্তন দলিল—যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

গদ্যের মাঝে মাঝে চিত্তাকর্ষক কবিতাগুলিকে আপাতত আলোচনাতে না রেখে গদ্য রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে যা অনুধাবন করা যায়, তার একটি মূল্যায়ন তুলে ধরলে দেখা যায় যে—

প্রথম পাঠ ঃ মাত্র দশটি লাইনে যেন সুবিশাল এক পটচিত্র এঁকেছেন লেখক। সেখানে 'ং' সম্বলিত শব্দগুচ্ছ দিয়ে অভিনয় শেখানোর কথা উল্লেখ আছে দূরবর্তী স্থান থেকে আগত পাংশুপুরের রাজাকে। উল্লেখ আছে সংসারবাবুর মায়ের মিষ্টি আবদারের কথা, নানাবিধ শাক, তথা চিংড়ি মাছ, ট্যাংরা মাছ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ পনেরটি লাইনে 'য' য-ফলা সম্বলিত শব্দের আধিক্যে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা করা হয়েছে। কন্যার বিবাহের সময় দুই পক্ষের যে পারিবারিক অবস্থান তার নিখুঁত বর্ণনা আছে।

আদ্যনাথবাবুর সামাজিক দেশ ও দশের কল্যাণকর কাজের সুখ্যাতি আছে। তাই তাঁর কন্যার বিবাহে ভৃত্য সত্য মারফৎ নিমন্ত্রণ পাঠানো সত্ত্বেও লেখক সৌহার্দ্যের যুক্তিতে যাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ভালো ফসল পেয়ে উল্লসিত চাষীরা, তারাও আমন্ত্রিতের তালিকায়, ছেলেরা ভিড় করে আছে নৃত্য করছে, এমনকী ব্যাটবল খেলার উল্লেখ আছে।

তৃতীয় পাঠ ঃ 'ঙ্গ' সম্বলিত শব্দ আছে তৃতীয় পাঠে। একটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান—যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আজকেও। একটি নির্দিষ্ট দিনে পাড়ার জঙ্গল সাফ করার ব্যস্ততা। প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ছোটবড় সবাই থাকবে এই কর্মযজ্ঞে। পঙ্গপাল পাড়ার সবজি বাগানে ক্ষতি করেছে। তাও তাড়ানোর বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। আর সবাইকে উৎসাহ দিতে শেষে ঈশানবাবুর ইঙ্গিতে কিছু দান করার কথা সত্যিই অবাক করে দেয় সবাইকে।

চতুর্থ পাঠ ঃ 'ন্দ' শব্দ দিয়ে অধিকাংশ বাক্য সমাহারে মাত্র বারোটি লাইনে অতিথি আপ্যায়নের যে মনোময় উদাহরণ তা সত্যিই ভাবায়। বন্ধ ঘর খুলে রাখা—নিশ্চয়ই অতিথির ঘরে আলো-হাওয়ার দরকার। ঘরের পবিত্রতার জন্য ধূপ ও ধুনোর গন্ধ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। আর সুদৃশ্য ফুলদানিতে কুন্দফুল ও আকন্দ থাকলে এমনিই মন ভালো হতে বাধ্য ও রুচিশীলতার নজিরও বহন করবে। অতিথির সঙ্গে যিনি আসছেন তাঁর আলাদা ঘর এমনকী, অতিথির তোরঙ্গ, বিশিষ্ট অতিথি তিনি তা আলাদা ঘরে রাখবার নির্দেশ।

অতিথিকে বরণ করবার জন্য আগে থেকে মালাচন্দনের ব্যবস্থা থাকবে। তিনি যেহেতু কাজ দেখতে আসবেন, তাই 'বন্দেমাতরম্' গানটা জানা আছে কিনা তাও নন্দীকে আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। অতিথিকে স্বাগত জানানোর পূর্ণ প্রস্তুতি, এমনকী গান জানা অন্ধগায়ককেও ডেকে আনার কথা বলা হয়েছে, অতিথির মনোরঞ্জন-এর জন্য।

পঞ্চম পাঠ ঃ '´' রেফ যুক্ত শব্দের মূর্ছনায় প্রথম বর্ষার চিত্র লেখক বর্ণনা করেছেন। যেমন চাষীদের দুর্গতি, ঘরে ঘরে সর্দিকাশি, গরুগুলির এক হাঁটু পাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা, সর্ষেক্ষেত ডুবেছে, দুর্গানাথের আঙিনায় জল উঠে দরমার বেড়া ভেঙেছে।

এর পাশাপাশি 'কর্তাবাবু' যিনি, তিনি বর্ষাতি পরে সঙ্গে আরদালি তুর্কি মিঞা-কে নিয়ে চলেছেন।

ষষ্ঠ পাঠ ঃ ষষ্ঠ পাঠে '্র' র-ফলা যুক্ত শব্দের বিন্যাসে, দুদিনের ছুটিতেও বর্ষার রূপ দেখতে ব্যাকুল যে যার ইচ্ছামতো। মিশ্রদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার চিন্তা, সাথে মিষ্টান্ন খাবার-দাবার, এমনকী কান্ত চাকরের খাওয়া হয়েছে কিনা তারও খোঁজ খবর আছে।

সপ্তম পাঠ ঃ সপ্তম পাঠে ষষ্ঠ পাঠের ভাবধারা অক্ষুণ্ণ আছে। রাস্তা ভ্রমণের জন্য খাস্তা কচুরি, পেস্তা বাদামের কথা উল্লেখ আছে। রাস্তায় রেঁধে খাওয়ার জন্য জলের পাত্র, বাসনকোসন, মাছ আলু ওল ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার কথা বলা আছে।

অষ্টম পাঠ ঃ অষ্টম পাঠে বর্ষার রেশ তখনও চলছে। সকাল সকাল মেঘের ঘনঘটা অফিস যাওয়ার আগে অসুস্থ শরীরে চিন্তার মেঘও। রান্না সম্পূর্ণ হয়নি, অসুস্থ শরীরের জন্য ঝোলে লঙ্কা না দেওয়ার জন্য ঠাকুরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। শেষের লাইনগুলিতে 'ঙ্ক' যুক্ত শব্দের আধিক্য আছে।

নবম পাঠ ঃ নবম পাঠে 'ষ্ট' 'ঞ্জ' যুক্ত শব্দ নিয়ে বর্ণনা। দুষ্টু কেষ্টকে ঘরে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, কারণ বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে। যিনি ছাতা নিয়ে বাইরে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন, তিনি কেষ্টকে মিষ্টি লজেঞ্চুস পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করছেন ও রঞ্জন নামে বন্ধুকেও বাড়ি থেকে খেলা করবার জন্য ডাকার আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন।

অতিবৃষ্টিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ব্যাঙগুলিকে তাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে।

বোষ্টমি গান গাইতে এসেছে, তাকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে বসিয়ে রাখতে না বলা হচ্ছে। কারণ বৃষ্টিতে ভিজলে সেও কষ্ট পাবে।

দশম পাঠ ঃ দশম পাঠে 'ক্ক', 'ল্ল', 'ঞ্চ', 'জ্জ', 'জ্ব' ইত্যাদি যুক্তাক্ষরগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

রাত্রি গভীর হলে চারিদিকে নিঃস্তব্ধ, তখন প্রকৃতির নিজস্ব কিছু শব্দ দিয়ে রাত্রির জালবোনা হয়, তাতে জেগে থাকলে যা অনুভূতি, সে সকল মনন চিন্তনে দশম পাঠ সাজানো, আবার পাশাপাশি অতিরিক্ত ভয়ও যে লজ্জাজনক, তাও বোঝান হয়েছে। যেমন, হাওয়ায় দরজার ধাক্কা, উল্লাপাড়ার মাঠে শেয়ালের ডাক, নির্জন রাত্রে এক্কাগাড়ির শব্দ যা মেঘ গুড়গুড় বলে বোধ হচ্ছে, অশ্বত্থগাছে পেঁচার ডাক। উচ্ছের ক্ষেত থেকে ঝিল্লির ঝিঁ ঝিঁ।

দেখতে দেখতে সকাল হলো, চা-বিস্কুট খেয়ে প্রাতঃভ্রমণের উল্লেখ আছে।

কুন্ডুদের বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টার ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে।

তাতে মনে করিয়ে দেওয়া মন্টু যেন বারান্দা পরিষ্কার করে রাখে, এখনি রেভারেন্ড এন্ডারসন ও পণ্ডিতমশাই এসে যাবেন।

একাদশ পাঠ ঃ একাদশ পাঠের শব্দ বুনন, 'ক্ত', 'স্ত', 'ক্র', 'ন্দ', 'ক্ল' ইত্যাদি যুক্তাক্ষরে সজ্জিত।

পরাক্রমী, প্রভাবশালী শক্তিনাথবাবুর জেলেপাড়াতে বাস। তিনি শক্তকাঠের তৈরি ভক্তরামের নৌকো, সস্তা দামে কিনে, মনের মতো রঙ করিয়ে জুতসই নাম দিয়ে তার দুই কুস্তিগির দারোয়ান নিয়ে কখনও তিস্তা, কখনও আত্রাই কখনও ইছামতীতে বেড়াতে যান, আবার বাঘ এসেছে জঙ্গলে খবর পেলে শিকারেও বেরিয়ে পড়েন মাঝে মধ্যে, সঙ্গে বল্লম আর গুলি বারুদের বাক্সও থাকে। বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে এই যাত্রা যে বেশ রোমাঞ্চকর, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারপর বিপর্যস্ত হয়ে কাঠুরিয়াদের কুঁড়েঘরে আশ্রয় ও আদর যত্ন, অন্য আর এক গল্পের আস্বাদন সৃষ্টি করে।

শক্তিবাবু কাঠুরিয়াদের সর্দারকে উপকারের বিনিময়ে দশ টাকা বক্‌শিশ দিতে চাইলে তাতে সর্দার নিতে অসম্মত হয়ে বিরাট মহানুভবতার পরিচয় দেখিয়েছে।

সর্দার আরও বলেছিল, টাকা নিলে অধর্ম হবে, এই বলে নমস্কার জানিয়েছিল।

দ্বাদশ পাঠ ঃ গুপ্তিপাড়ার ডাক্তার বিশ্বম্ভরবাবুর পালকি চড়ে রোগী দেখতে যাওয়ার সময় তার সাথী চাকর শম্ভুর যে সাহসিকতা বা বীরত্বের গল্প—তা কোনো সিনেমার গল্পের চেয়ে কম না! কখনো কুম্ভীরার জঙ্গলে শুধু লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করে ভাল্লুকের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া আবার কখনো নদীর জলে লাফিয়ে কুমীরের পিঠে দা দিয়ে আক্রমণ করে বাছুরকে বাঁচানো ইত্যাদি।

সেবার একটু অন্যরকম ঘটনা, তাঁরা পড়েছিলেন ডাকাতদের খপ্পরে। দূরের পথে রোগী দেখতে যাওয়া স্বাভাবিক কারণেই রাত্রি হওয়ার কথা।

ভেঙে পড়া পালকির ডাণ্ডা দিয়ে শম্ভু এবারেও একা পাঁচজন ডাকাতকে কাবু করেছিল। কারণ পালকির বেহারারা ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—ডাকাতরা পরাজিত হয়েছিল। আরও আশ্চর্যের কথা, ডাক্তারবাবু শম্ভুর সহযোগিতাতে আহত তিন ডাকাতের শুশ্রূষা করেছিলেন।

ত্রয়োদশ পাঠ ঃ শেষ এবং ত্রয়োদশ পাঠের গল্প-এর অভাবনীয়, মনোমুগ্ধকর পরিসমাপ্তি।

সদ্‌গোপ উদ্ধব মণ্ডলের কন্যা নিস্তারিণীর বিবাহ। কিন্তু কন্যার পিতা দিনমজুরি করে। পাত্র বটকৃষ্ণ দরিদ্র, চাষাবাদ করে তবুও তার বাড়িতে পূজা অর্চনা ক্রিয়াকর্ম হয়।

পদ্মপুকুর আগে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু দুর্লভবাবু সে অধিকার বন্ধ করে বৃন্দাবন জেলেকে খাজনা দিয়েছেন। উদ্ধবের একথা অজানা ছিল। তাই তার

কন্যার বিবাহের জন্য বড় রুই মাছ ধরবার পর হলো বিপত্তি।

এদিকে আবার দুর্লভবাবুর ছোট কন্যার অন্নপ্রাশন, তাঁর কর্মচারী কৃত্তিবাস তাই পুষ্করিণীর ধারে এসে রুইমাছটি উদ্ধবের হাত থেকে কেড়ে নিল।

ধনঞ্জয় পেয়াদা বলপূর্বক উদ্ধবকে ধরে নিয়ে গেল দুর্লভবাবুর কাছে।

দুর্লভের বিশ্বাস ছিল, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উদ্ধব অত্যাচারী বলে তার বদনাম করেছে। তাই তাকে মাছ চুরির দণ্ড দিতে হবে এবং 'দশ টাকা' দণ্ড ধার্য করা হলো।

উদ্ধব হাতজোড় করে নিজেকে অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আসনে বসালেও বরফ গলল না।

দুর্লভের পিসী কাত্যায়ণী ঠাকরুণ অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে অন্তঃপুরে উপস্থিত ছিলেন। উদ্ধবের স্ত্রী মোক্ষদার অশ্রুসজল কাকুতিতে কাত্যায়ণী ঠাকরুন-এর নারীসত্তা বিগলিত হলো।

কাত্যায়ণী ভাইপো দুর্লভকে নিষ্ঠুর না হওয়ার উপদেশ দিলেন, কারণ দুর্লভও একজন শিশুকন্যার পিতা। কল্যাণ-অকল্যাণের জের তুলেও দুর্লভ-এর মন নরম হলো না।

কৃত্তিবাসকে ডেকে কাত্যায়ণী ঠাকরুন নিজে 'দশ টাকা' জরিমানা ভরলেন, উদ্ধব ছাড়া পেয়ে লজ্জায় অপমানিত হয়ে সে স্থান ত্যাগ করল।

পরদিন গোধূলি লগ্নে নিস্তারিণীর বিবাহে, কাত্যায়ণীর পরিচালনায় নিঃশব্দে বাহকরা মাছ, দই, থালায় ভরা সন্দেশ, একখানি লাল চোলির শাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

তার কিছুক্ষণ পরেই, উদ্ধবের কুটিরের সামনে পালকি করে এসে কাত্যায়ণী ঠাকরুন উদ্ধবকে তার অপমানের কথা ভুলে যেতে বললেন এবং নিস্তারিণীকে তিনি একগাছি সোনার হার পরিয়ে দিলেন ও আশীর্বাদ করে যৌতুক হিসাবে হাতে একখানি একশত টাকার নোট দিলেন।

দুর্লভের পিসীমার এই উদারতা ও একজন নির্ধন অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে আশ্বস্ত করা সমাজে আজও অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের দাবি রাখে।

(৭১২ পৃষ্ঠায় 'চলো যাই হিমাচলে'-র শেষাংশ)

এবার যাব সাংলা। অনেকটা উঁচুতে অবস্থিত হওয়ার জন্য এখানকার ঠাণ্ডাও অনেক বেশি। এখানকার রাস্তা খুব বিপজ্জনক হওয়ায় আমরা রকছম্ গ্রাম দেখার পরিকল্পনা বাতিল করে ফিরলাম হোটেলে। পরের দিনের তালিকাতে ছিল বহু প্রতীক্ষিত চিতকুল।

সকাল ৮.৩০টায় বেরিয়ে পড়লাম চিতকুলের উদ্দেশ্যে। বরফের রাজ্যে কিছুক্ষণ কাটানোর সুযোগটা শেষে চলেই এল। চিতকুল হিমাচলের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। হিমাচলের শেষ গ্রাম এটি। এরপর আর মানুষের যাওয়ার অনুমতি নেই। যাওয়ার পথে প্রথমেই চোখে পড়ল বাসপা নদী। এখানকার বেশিরভাগ ঘর কাঠের। এপ্রিল-মে মাসেও এখানে তুষারপাত হয়। বরফের মধ্যে দিয়ে গাড়ি গিয়ে থামল কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্পে। সেখানে আইনত অনুমতি নিয়ে এবার শুরু হলো হাঁটা পথ। উঁচু নীচু রাস্তা ও সেতু পেরিয়ে পৌঁছলাম সেই স্বপ্নরাজ্যে। চারপাশ বরফে মোড়া একটি বিস্তৃত জায়গা। যার মধ্যে বিক্ষিপ্ত সবুজ গাছপালা। আর নীচে বয়ে চলেছে বরফে গলা সবুজ জলের নদী। জলের স্রোতের কলকল শব্দে চারপাশ মুখরিত। জায়গাটিকে ছোট বড় পাথর দিয়ে ঘিরে রাখা। দূরের নীল আকাশ ও সাদা বরফ যেন মিলেমিশে একাকার। তুষারপাত হয়তো দেখা হলো না কিন্তু যা পেলাম তাই বা কম কী!

বরফে ঢাকা চিতকুল

এবার কলকাতায় ফেরার পালা। তবে ফেরার পথে একদিনের জন্যে চলে এলাম রামপুর। এখানকার বৌদ্ধ মন্দির, লাইব্রেরী ইত্যাদি দেখার পর সন্ধ্যেবেলা গেলাম রামপুর মার্কেটে। সাজানো গোছানো অঞ্চল রামপুর খুব মোহময়। আর এখানকার মার্কেট কিন্তু ঘোরাফেরা ও স্মৃতি-কেনাকাটার জন্য খুবই উপযুক্ত।

২০০০ সালের পর সিমলার ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার হস্তান্তরিত করা হয় রামকৃষ্ণ মিশনকে। ২০১৩ সালের পর থেকে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটি ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে রূপান্তরিত হচ্ছে—যা দেখার সৌভাগ্য এবারে না হলেও পরের বার এই পুণ্যভূমি দর্শনের আশা রইল।

চিকিৎসা

ব্যাণ্ড-এইড-এর ইতিকথা

অরিজিৎ প্রধান

ব্যাণ্ড–এইড আমেরিকান ফার্মাসিউটিক্যাল এবং মেডিক্যাল ডিভাইস কোম্পানি জনসন দ্বারা বিতরণ করা আঠালো ব্যাণ্ডেজের একটি ব্রাণ্ড। এটি ১৯২০ সালে উদ্ভাবিত হয়েছিল জনসন অ্যাণ্ড জনসন কোম্পানির এক কর্মচারী আর্ল ডিকসন–এর দ্বারা। ঠিক বিশ শতকের গোড়ার সময়। আমেরিকার নিউ জার্সির গৃহবধূ জোসেফিন নাইট। এই জোসেফিনের বিয়ে হয় আর্ল ডিকসন নামের এক তূলা ক্রেতার সঙ্গে। আর্ল ছিলেন বিখ্যাত জনসন অ্যাণ্ড জনসন কোম্পানির কর্মী।

ঘরকন্নার কাজে একদম অভিজ্ঞতা না থাকায়, রান্না–বান্না, কাটা–কুটি করতে গেলে হামেশাই হাত কেটে যেত জোসেফিনের। অফিস থেকে ফিরে জনসন অ্যাণ্ড জনসন কোম্পানিরই গজ ও টেপ ব্যবহার করে স্ত্রীর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে দিতেন আর্ল। এদিকে প্রাত্যহিক কাজে বহুল ব্যবহৃত আঙুলের মতো ছোট অঙ্গে এ–ধরনের ব্যাণ্ডেজ কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতো না এবং এগুলো বেঁধে রাখাও ছিল কষ্টসাধ্য।

এমতাবস্থায় এই সমস্যা সমাধানের এক অভিনব পন্থা বের করলেন আর্ল ডিকসন। তিনি এক টুকরো টেপ কেটে নিয়ে তার ঠিক মাঝখানে আটকে দিলেন ছোট্ট এক টুকরো গজ। আর এই গজটিকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য তার উপরে দিলেন ক্রিনোলিনের প্রলেপ। এতে নিরাময় হলো জোসেফিনের ক্ষত।

ডিকসন তাঁর এই চিন্তাভাবনা কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারিদের সাথে বিনিময় করেন। আর্লের এই অভিনব পন্থাটি সঙ্গে সঙ্গেই লুফে নিলেন তাঁর বড়কর্তা জেমস জনসন। সিদ্ধান্ত নিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই পণ্যটিকে বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করার। যেরকম ভাবা সেরকম কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই জনসন অ্যাণ্ড জনসনের তত্ত্বাবধানে বাজারে এলো ব্যাণ্ড–এইড (Band-Aid) নামের এই চটজলদি ক্ষত নিরাময়ের উপকরণ। জনসন অ্যাণ্ড জনসন–এ ডিকসনের সফল ক্যারিয়ার ছিল এবং ১৯৫৭ সালে অবসরের আগে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

সামগ্রীটিকে পরিচিত করাতে মজার একটি কৌশলও বেছে নেয় প্রতিষ্ঠানটি। ১৯২৪ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বই–স্কাউটদেরকে বিনামূল্যে ব্যাণ্ড–এইড বিতরণ করে জনসন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৩৯ সালে বাজারে আসে মেশিনে তৈরি জীবাণুমুক্ত ব্যাণ্ড–এইড। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ ব্যাণ্ড–এইড বিদেশে পাঠানো হয়েছিল, যা পণ্যটিকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছিল। ১৯৫৮ সাল থেকে ব্যাণ্ড–এইড তৈরিতে ভিনাইল টেপের ব্যবহার শুরু হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যাণ্ড–এইড–এর সংযোজন অতি ক্ষুদ্র হলেও ভূমিকায় প্রমাণিত হলো অসাধারণ। দামের তুলনায় তো বটেই, আকার–আকৃতিতে ছোট হলেও চিকিৎসা জগতে ব্যাণ্ড–এইড–এর রয়েছে বিশেষ অবদান। দিনে দিনে শুধু জোসেফিনের নয়, তাঁর বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের কাটাছেঁড়ার দাওয়াই হয়ে উঠল, হয়ে উঠল সব থেকে বড় আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ডগুলোর মধ্যে একটি।

নতুনভাবে যুগোপযোগী করে ব্যাণ্ড–এইড বাজারে আসছে বা এসেছে। ওয়াটারপ্রুফ ব্যাণ্ড–এইড তো আমরা ব্যবহার করছিই। এটি সাময়িকভাবে ছোট্ট কাটা–ছেঁড়ায় ভীষণ উপকারী। শুধু তাই নয়, আমরা অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করেছি, হঠাৎ কেটে যাওয়াকে চটজলদি চিকিৎসা দেওয়াতে এটি–র জুড়ি মেলা ভার। সাময়িক কাজের হলেও ঠিক সেই সময়ের প্রয়োজনীয়তার দাম অনেক। সুতরাং ব্যাণ্ড–এইড সত্যই তাৎক্ষণিক অতি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী।

ভ্রমণ

চলো যাই হিমাচলে

বাসন্তী মণ্ডল

গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে যখন সারা কলকাতা হাঁসফাঁস করছে, তখন একটুকরো শীতলতার আমেজ খুঁজতে শুরু হলো আমাদের পরিকল্পনা। তবে এবারের উদ্যোগ পারিবারিক নয়। বরং এবারের ভ্রমণের দায়িত্বভার নিয়েছিল আমাদের বি. এড. কলেজ। ভ্রমণ পারিবারিক হলে তাতে থাকে এক অসীম শান্তি কিন্তু তা যদি হয় এক ঝাঁক সমবয়স্ক সহপাঠীদের সাথে, তাহলে তাতে যে অফুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের নেশা থাকবেই সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সিমলার ম্যাল শহর

আমাদের এবারের ঠিকানা সিমলা। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে কালকা মেল চেপে আশি জন মিলে চললাম গন্তব্যস্থলের পথে। ভোর তখন ৫টা, নামলাম আম্বালা স্টেশনে। সেখান থেকে গাড়ি করে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে যতই উপরে উঠতে লাগলাম, ততই যেন অদেখাকে দেখার নেশা প্রবল হতে লাগল। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডাটাও বেশ প্রবল হচ্ছিল। বেলা তখন দুটো, গাড়ি পৌঁছাল পূর্ব-নির্ধারিত হোটেলে। দুপুরের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সিমলা ম্যাল ও রিজ রোড দেখতে। তখন বিকেল গড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সূর্যের আলো লাল হয়ে আসছে। চারিপাশে পর্যটকের মেলা। ম্যালের দুই ধারের বিভিন্ন দোকানগুলি তাদের পসরার সঙ্গে যেন রাস্তাগুলিকেও ঝলমলে করে তুলেছে। আমরা প্রথমে গেলাম সিমলা কালীবাড়ি দর্শনে। সময়টা নবরাত্রি পর্বের হওয়ায় মন্দিরের আলোকসজ্জা ছিল দেখার মতো। সেখান থেকে গেলাম সিমলার সেই প্রাচীন গীর্জা দেখতে। তারপর দেখা মিলল এখানকার প্রসিদ্ধ জাখু হনুমান মন্দির প্রাঙ্গণের সেই সুদীর্ঘ হনুমান দেবতার—যা পৃথিবীর সকল দীর্ঘ আশ্চর্যগুলির মধ্যে অন্যতম। উপর থেকে যতই নীচে নেমে আসা হোক না কেন, এই মূর্তি কিন্তু আপনাকে ঠিক দর্শন দেবেই। ম্যাল ঘুরে এবার হোটেলে নামার পালা। তখন রাত ৮টা। পাহাড়ের উঁচু থেকে নীচের শহরের সৌন্দর্যটা যেন প্রদীপে ভরা দীপাবলির রাত। তবে সিমলার সেই ঐতিহাসিক বার্নেস কোর্ট তথা রাজভবন দেখার ইচ্ছেটা কিন্তু অপূর্ণই রয়ে গেল—যা কিনা স্বাধীনতার পূর্বের ও পরের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। ১৯৭২ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 'দ্য সিমলা এগ্রিমেন্ট' এই কোর্টেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

জাখু হনুমান মন্দির

পরের দিন চললাম কুফরির উদ্দেশ্যে। এটি একটি সাজানো গোছানো হিল স্টেশন। এখানে আছে একটি পার্ক, যেটিতে হিমাচল প্রদেশের বহু প্রজাতির প্রাণী ও পাখি আমাদের নজর কাড়ে। এছাড়া কুফরির পিকনিক স্পটগুলিও খুব মনোরম। শীতে কুফরি পুরো বরফের চাদরে ঢেকে যায়। আমরা অবশ্য তেমন বরফ পাইনি। এখানে বিভিন্ন রকম অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরাও ঘোড়ায় চড়ে গেলাম কুফরি টপ দেখতে।

তারপর গেলাম সারাহান দর্শনে। সকাল সকাল প্রাতরাশ সেরে বেরোলাম গাড়ি করে সারাহানের পথে। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের দেখা তো হলোই, সাথে এখানের ভীমাকালীমাতার দর্শন কিন্তু এক অমূল্য পাওনা। শোনা যায়, সারাহান নাকি অতীতে বুশহর রাজাদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। এই মন্দির দেবী সতীর ৫১ পীঠের মধ্যে একটি। তাই সারাহান কিন্তু হিমাচলের এক বিশেষ তীর্থক্ষেত্র।

পরবর্তী গন্তব্য কল্পা। অতীতে এটি ছিল কিন্নর জেলার সদর দপ্তর। তিব্বতীয় শৈলীতে তৈরি মন্দির ও আপেল বাগানে ঘেরা রাজ্যটি যেন স্বর্গরাজ্য। আর তাতে শোভা বর্ধন করেছে নানান নাম না-জানা অর্কিড জাতীয় রঙবেরঙের ফুল। তবে আফশোস এটাই যে, আমরা আপেল গাছে কোনো ফল বা ফুল কিছুই দেখতে পেলাম না। এখান থেকে কিন্নর কৈলাস শৃঙ্গ ও তার পার্শ্ববর্তী শৃঙ্গের চূড়ার পাথরটিকে স্পষ্ট দেখা যায়—যা কিনা একটি শিবলিঙ্গ। দিনের নানান সময়ে এই শিবলিঙ্গের রঙও বদলাতে থাকে। এই কিন্নর কৈলাসের পিছন দিয়ে যখন সকালে সূর্য ওঠে, তা যেন পুরাণ-কথিত কোনো সর্পের মণি থেকে ঠিকরে আসা আলোর ছটা। চিরাচরিত লাল বা কমলা রঙের উদিত সূর্যের সাথে এর যেন কোনো মিল নেই।

(এর পরবর্তী অংশ ৭১০ পৃষ্ঠায়)

ঐতিহ্য

‘অতিথিদেবো ভব’

যুধাজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

সেই কোন কালের গর্ভ থেকে উঠে আসা বাক্য ‘অতিথিদেবো ভব’। অতিথি তোমার দেবতা হন। গৃহে অযাচিতভাবে কোনো মানুষজন ক্ষণিকের জন্য এলে, তাঁকে অতিথি হিসাবে গণ্য করা হয়। অতিথি আগমনকে গৃহস্থের মঙ্গলদায়ক হিসাবে পরিগণিত করা হতো। সেই কবে থেকে শুনে আসছি বা দেখে আসছি, বাড়িতে কেউ ক্ষণিকের জন্য এলে তাঁর খাতিরের কী ঘটা! পা ধোয়ার জল দেওয়া থেকে শুরু করে নানা ব্যঞ্জনে থালা সাজিয়ে নিবেদন করা পর্যন্ত। আহা! কী সে যত্ন। ভাবলেও প্রাণ জুড়িয়ে যায়। নিজের বাড়িতে এই সব কাণ্ড দেখে খুব মনে পড়তো, আমরা কবে অন্যের অতিথি হব?

ভারতের সংস্কৃতিতে অতিথির স্থান দেবতার মতো। তাই বলা হয় ‘দেবতা নারায়ণ’। তাই যুগ যুগ ধরে কত জাতির কত মানুষ ভারতবর্ষে এসেছেন তাদের কত আদরযত্ন করে আমরা স্থান দিয়েছি। তাদের স্ব স্ব ধর্মচিন্তা অটুট রেখে কত অতিথি স্থায়ীভাবে এখানে থেকে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কত অতিথির স্বস্থানে হয়তো তার ধর্ম বিলুপ্ত হলেও ভারতে তাঁরা এখনো তাঁদের পুরানো ধর্মভাব বজায় রেখে অবস্থান করছেন। তাই তো ভারতের ভূ-ভাগ নানা ধর্মের মানুষের নানা রঙে রাঙানো হয়ে আছে। স্বামীজী বলছেন ঃ ‘আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি।’ সেই জন্য শাস্ত্রেও পাই—(শ্রীপুষ্পদন্তকৃত ‘শিবমহিম্নঃ’ স্তোত্রে)

‘রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।’

—এই ভাবই আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি।

অনেক সময় এই ভাবকে অনেকে আমাদের দুর্বলতা ভেবেছেন। আর তার সুযোগ নিয়ে আমাদের হৃদয়ের ভাবকে অর্থাৎ জাতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চেয়েছেন কিন্তু সনাতন শাশ্বত ভাব সঙ্কুচিত হয়ে আবার প্রসারিত হয়েছে। আর যারা একে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তাঁরাই বিতাড়িত হয়েছেন।

আমরা এক সময় নিজের সুখ-সুবিধা সব বিসর্জন দিয়ে অতিথি সেবা করেছি, বহু পৌরাণিক গল্পে পাই নিজের জীবন উৎসর্গ করে অতিথি সেবা করেছেন এই ভারতের নাগরিকগণ।

এখনও সেই ধারা টিকে আছে। শহরের থেকে হয়তো এখন গ্রামে ভারতবর্ষীয় রীতির শিকড় খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানে শহর কেন্দ্রিক রীতিতে বেশ কিছু পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবেশ করেছে। রাজনীতির হাত ধরে তা সংক্রমিত করছে ভারতের গ্রামবাংলাকেও। তবুও কিছু মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে।

খুব মনে পড়ে, স্বামীজীর জন্মসার্ধশতবর্ষে ছত্রিশগড়ের নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সমাবেশে যোগদান করতে যাওয়ার কথা। রায়পুর থেকে বিশেষ বাসে নারায়ণপুরের দিকে রওনা দেওয়া হয়েছে। তখন মাওবাদীদের নামে এক আতঙ্ক ঐদিকে খুব জোরালো। রাস্তায় রাস্তায় বারবার পুলিশি তল্লাশি। বাসগুলি যেতে যেতে হঠাৎ করে এক জায়গায় থেমে যায়। বাঁশের দড়িকল করে বাসগুলি আটকানো। সবাই ভাবলাম পুলিশি তল্লাশি। কিন্তু কোথায় পুলিশ, সেরকম তো কিছু নেই। সকলের মনে একটা ভয় ভয় ভাব। তারপর দেখা গেল, এই এলাকার মানুষজন, ছোট বড় ঘরের মায়েরা পর্যন্ত গ্লাস নিয়ে সুন্দর স্বাদপূর্ণ সরবত সরবরাহ করছেন প্রত্যেক বাসের যাত্রীদের। কী অদ্ভুত জোর, না করার উপায় থাকে না। প্রচণ্ড গরমে যেন প্রাণ জুড়িয়ে দেওয়া সরবত। আর তা গ্রহণ করলে তাঁরা যেন আনন্দে ভরে উঠছেন।

আসলে তাঁরা জানেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রী, সন্ন্যাসিরা সব আসছেন। তাঁরা তাঁদের অতিথি। অতিথিরূপে দেবতাকে সেবা দেওয়ার জন্যই তাঁদের এত কর্মকাণ্ড।

নর্মদা পরিক্রমা যাঁরা করেন তাঁরাও বলেন, মানুষের প্রাণে প্রাণে প্রেমের পরশ জানা যায়। গ্রামের অতি সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষও পরিক্রমণরত সাধু-মহাত্মা ও ভক্তদের তাঁরা সেবা করে চলেছেন। এটাই তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলেই মনে করেন। এই হচ্ছে ভারতবর্ষ।

শহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় অতিথি আসছে শুনলেই বাড়ির

মানুষের নীরবে নিভৃতে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। কি হবে? কে এতো খাটবে? কে রান্না করবে? কত টাকা যে খরচ হবে ইত্যাদি। আর ফ্ল্যাটকেন্দ্রিক নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি সুতরাং যিনি আসছেন তিনি কোথায় থাকবেন? পাশ্চাত্যের মতো নিজের পিতামাতার স্থান সঙ্কুলান হয়ে ওঠে না, যার জন্য তাদের অসহ্য বলে মনে হয়। সুযোগ পেলেই তাদের বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয় সেখানে আবার অতিথি। যেন মাথায় বাজ পড়ার অবস্থা। এই অভিজ্ঞতা যেমন আমাদের আছে তেমনি আছে গ্রামবাংলার কিছু গৃহ দেখার। হয়তো অনেকেই আছেন কিন্তু নিজের চোখে দেখা এই রকম গৃহের কথাই বলি।

কুলতলি ব্লক যা কিনা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া ব্লক। সেই অঞ্চলে কর্মসূত্রে ভুবনেশ্বরী এলাকার পূর্বগুড়গুড়িয়া গ্রামে আমায় দীর্ঘদিন যেতে হয়। প্রথম যখন গেছিলাম, সেদিন সকাল ৬টায় বেরিয়ে বেলা ১১টায় পৌঁছেছিলাম। প্রকৃত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভিতরের অঞ্চলের হাল অত্যন্ত নিম্নমানের—যেমন যাতায়াত ব্যবস্থা তেমনি অন্যান্য দিক দিয়ে। যাই হোক, আমি যখন পৌঁছাই তখন দেখলাম মূল রাস্তা থেকে আমার কর্মস্থল হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে ইটের রাস্তা ধরে ৩০ মিনিট হেঁটে ঢুকতে হবে। আশেপাশে কোথাও খাওয়া-দাওয়ার তেমন ব্যবস্থা তো নেই, সামান্য শুকনো মুড়ি কিনে খাওয়ার মতোও জায়গার অভাব। যাই হোক, পৌঁছে প্রথম প্রথম কর্মস্থলের সবার রান্নার সাথে আমরাও আছি জানিয়ে দিয়ে কর্মে যুক্ত হতাম। কিন্তু লক্ষ্য করতাম, যখন আমরা খেতে বসতাম তখন অনেক মায়েরা নিজেদের বাড়ি থেকে তরকারি, দুধ, ঘোল ইত্যাদি নিয়ে এসে খুব আদর করে খাওয়াতেন। আরো একটু পুরানো হলে বাড়িতে বাড়িতে নিমন্ত্রণের বহর শুরু হলো। এরপর যখন নানা পরিস্থিতিতে কর্মস্থলে রান্না বন্ধ থাকত, তখন প্রধানত দুটি বাড়ি থেকে পালা করে আমাদের খাওয়াতেন। খুব যত্ন করে হাতে জল ঢেলে দিয়ে, হাত শুকনো করার গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, নানা ব্যঞ্জনে তাঁদের যত্নের সীমা ছিল না। এই অতিমারি পরিস্থিতিতে যখন আমাদের মাসে অন্তত একবার করে কর্মস্থলে যেতে হতো, তখন রান্না তো বন্ধ, কিন্তু এক ভদ্রমহিলা যেন মায়ের মতো আমাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তাঁকে বলতে হতো না। তিনি যদি দেখতেন আমরা এসেছি, সঙ্গে সঙ্গে রান্নার ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করতেন। কোনো বিরক্তি নেই। তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা সত্যই খুব খারাপ। রোজকারের রোজগারে খাওয়া-দাওয়া করে চলে। অন্যের জমিতে কাজ করেন। অন্যের ধান ভেনে দেন। আবার ধারদেনা করে ধান ছাঁটার মেসিন কিনে স্বামী-স্ত্রী মিলে চালান। জঙ্গলে যান। আরো কত কি! তার মধ্যে যদি আমরা ২টো নাগাদ চলে যাব শোনেন তো উনি কাঠের জ্বালে অন্তত কম করে তিনচার রকম পদ করে ১টা থেকে ১.৩০টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। আমরা তো আশ্চর্য, পৌঁছালাম ১১টায় আর আমাদের দেখে রান্না করে প্রস্তুত হতে লাগল মাত্র ২ ঘণ্টা। তাও গ্রামের মহিলা ভারতীয় রীতি অনুযায়ী কাপড় কেচে, স্নান করে রান্না ঘরে ঢোকেন। ভাবতেও অবাক লাগে, যখন আমরা শহরে নিজের বাড়িতে দেখি কাজের লোক সব কাজ করে দিয়ে যান, অন্য কোনো কাজ হয়তো নেই বললেই চলে, তাতেই অতিথি আসবেন শুনে সেকি অবস্থা। নাকের জলে চোখের জলে কাণ্ড। সেখানে হঠাৎ আসা অতিথিকে সযত্নে নিজে থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আদর করে যত্ন করে সেবা দিচ্ছেন। তখন শাস্ত্র না জানা এক গ্রাম্য মহিলার 'অতিথিদেবো ভব' শাস্ত্র বাক্যের কার্যে রূপান্তরকরণ দেখে আপ্লুত হতে হয়।

আমরা তথাকথিত ইংরেজি ঘরানার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করছি। মা, বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে অথবা রাস্তায় ফেলে রেখে এসে 'মাতৃদেবো ভব', 'পিতৃদেবো ভব' বাক্য অস্বীকার করে নিজেরাই দুঃখে জ্বালায় মরি। এই আমরাই শিক্ষক নিন্দায় মুখর হই, আমার সন্তানসন্ততিদের গায়ে আঁচড় পড়লে সেই শিক্ষক বা আচার্যকে মারতে উৎসাহিত করি। তাই তো আমরা 'শিক্ষাকে বহন' করে চলেছি 'বাহন' করতে পারিনি। মূর্খের মতো দুটো পাশ দিয়ে ভাবি আমরা বিজ্ঞজন হয়েছি। দুটি নাটক, কবিতা, সিনেমা কি কাব্য রচনা করে নিজেদের বুদ্ধিজীবী বানিয়ে ভারতীয় চিরাচরিত সংস্কৃতিকে নিন্দা করতে সভা সাজিয়ে গণমাধ্যমে হাজির হই।

কিন্তু কোথায় সেই মাতৃভক্তি, কোথায় সেই পিতৃভক্তি? কোথায় সেই শিক্ষকপ্রীতি? কোথায় সেই আতিথেয়তা?—যা ভারতবর্ষকে চির গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কোথায় সে জ্ঞান যার জন্য বারংবার প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বিদ্বজ্জন ছুটে এসেছেন।

আছে আছে সব আছে কিছু হারায়নি, হারাতে পারে না। যুগ যুগ ধরে হাজার চেষ্টা করেও এ জাতি মারা যায়নি, যাবেও না। হয়তো বা গ্রাম্য বধূর ঝাঁপির মধ্যে, হয়তো বা কোনো সন্ন্যাসীর নীরব সাধনায় লুকিয়ে পড়েছে। মানে সঙ্কুচিত হচ্ছে কিন্তু আবার প্রসারিত হবে ধীরে ধীরে, তার আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে। স্বামীজীর ভাব লেগেছে, সেকি ঘুমাতে আর পারে?

'ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

বিবেক-শোভা

‘শিকাগোর এক ব্যবহারিক সন্দেশ’

দেবশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৮ সাল। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বৎসর স্মরণ-মনন-অনুধ্যান অনুষ্ঠানে সমগ্র পৃথিবী মেতে উঠেছে। বিশেষত ভারতবর্ষ—স্বামীজীর অনুরাগীবৃন্দ। শিকাগোতে স্বামীজীর কঠোর সংগ্রাম ও পরিশেষে সাফল্য আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। এই বক্তৃতামালার আলোচনা-সমালোচনা বিগত একশো পঁচিশ বছর ধরে চলে আসছে। তবু যে ভাবনাটা নাড়া দেয়—এই ত্রিশ বর্ষীয় যুবক কি এমন বলেছিলেন যা আজো প্রাসঙ্গিক? বিশেষত তাঁর ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের জনমনোহারিণী বক্তৃতা। আপন মনেই চিন্তা করছিলাম, মনের মধ্যে দুটি শব্দ উঁকি দিল—‘Universal acceptance’, আমরা সকলকে আপন বলে গ্রহণ করি। মনের মধ্যে উঁকি দিল আরেকটি বাণী—শ্রীশ্রীমায়ের অন্তিম বাণী—‘কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার’। নিজের মনেই চমকে উঠলাম। স্বামীজীর ইংরাজী ভাষণে শ্রীশ্রীমায়ের সাদামাঠা বাংলা বাণী উচ্চারিত হলো। যদিও সময়ের ব্যবধান বিস্তর, স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার কাল ১৮৯৩। শ্রীশ্রীমায়ের এই বাণী জগৎ কল্যাণে উচ্চারিত হয়েছিল ১৯২০ সালে। মায়ের জগৎ সমক্ষে এই ঘোষণা যদিও অনেক পরে, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে এর আচরণ স্বামীজী বহু আগেই মায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দক্ষিণেশ্বর ও তার পরবর্তী কালে। শ্রীশ্রীমা সকলকেই আপন বলে গ্রহণ করেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ ত্যাগীশ্রেষ্ঠ সন্তানদের, গৃহীভক্ত ও তাদের সংসারক্লিষ্ট পরিবারদের, গ্রহণ করেছেন সমাজের নিম্নশ্রেণীর মেছুনী, ঝাড়ুদার, মুসলমান ডাকাতকে। এমনকী বাদ যায়নি সমাজের বিপথগামী মানুষ। সে যুগের কঠোর সামাজিক বিধানকে অগ্রাহ্য করে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী শ্বেতাঙ্গ ভক্ত মহিলাদের আপন বলে গ্রহণ করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে প্রত্যক্ষীকৃত ‘Universal acceptance’ স্বামীজী শিকাগো সভায় ঘোষণা করলেন। ‘Universal acceptance’-এর অপর উদাহরণ স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ আর্থ-সামাজিক-চারিত্রিক অবস্থা নিরপেক্ষভাবে সকলকে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজীর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ ‘নিস্করণ ভকতশরণ’। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন পাপীকে, গ্রহণ করেছেন তার পাপকে। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ সদম্ভে সে কথা ঘোষণা করতেন। গ্রহণ করেছেন রোগীকে, গ্রহণ করেছেন রোগীর রোগকে। প্রমাণ, মৃত্যুপথযাত্রী জগদম্বাদাসীর রোগমুক্তি। পরিবর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ কি পেলেন? গিরিশের পাপ গ্রহণ করে দুরারোগ্য ক্যান্সার। জগদম্বাদেবীর সুস্থতার পর, দীর্ঘ ছ'মাস শ্রীরামকৃষ্ণের নিদারুণ উদরপীড়া।

‘Universal acceptance’-এর উদাহরণ স্বামীজী স্বয়ং। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার মতো তিনিও নির্দ্বিধায় সকল ধর্ম বর্ণ জাতপাত সম্প্রদায়ের মানুষকে আপন করেছেন, যার সূত্রপাত তাঁর শৈশবে, বাড়ির বৈঠকখানায় সজ্জিত সকল জাতের হুঁকোয় টান দিয়ে পরীক্ষা করা—জাত যায় কি না? ভারত পরিক্রমার সময় ভারতবর্ষের দরিদ্রতম মানুষের কুটির ও ধনীর প্রাসাদ সমান চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। কায়রোর রাস্তায় পতিতা রমণীদের চরণস্পর্শের সুযোগ দিয়েছিলেন পরম করুণায়—যারা তাঁকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

শিকাগো ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ

আপন-আচরিত ‘Universal acceptance’-এর কথাই তিনি শিকাগো সভায় ঘোষণা করলেন।

‘Universal acceptance’-এর প্রত্যক্ষীভূত আরো কত প্রমাণ স্বামীজীর মানসপটে ছিল তা আমাদের ধারণার বাইরে, কিন্তু ভারতীয় জীবনে বহুল ব্যবহৃত এই ভাবরাশি সেদিন সভার মানুষকে এত আপ্লুত করেছিল এবং আজও করে।

‘Universal acceptance’—এই বাণীর ব্যবহারিক প্রয়োগের পিছনে রয়েছে একটি গূঢ় দর্শন। শ্রীশ্রীমা তাঁর সরল ভাষায় যা প্রকাশ করেছেন—‘সাধন করতে করতে দেখতে পাবে, আমার মধ্যেও যিনি, দুলে বাগ্দীর মধ্যেও তিনি।’ সকলের সঙ্গে একত্ববোধই ‘Universal acceptance’-এর রহস্যসূত্র।

(এর পরবর্তী অংশ ৬৮০ পৃষ্ঠায়)

স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃ-দর্শন

স্বামী দীননাথানন্দ

এ যুগের জীবন্ত অন্নপূর্ণা শ্রীমা সারদাদেবী। সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য সদাই ব্যস্ত। রামকৃষ্ণময় তাঁর জীবন। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন নরেন্দ্রর আগমন বার্তা মা অনুভব করলেই তার জন্য মোটা মোটা রুটি, ছোলার ডাল তৈরির প্রস্তুতি নিতেন। কিন্তু নরেন দক্ষিণেশ্বরে মায়ের দর্শন প্রায় করেননি বললেই চলে। মায়ের মাতৃত্বের স্বাদ মায়ের হাতের রান্নার মধ্য দিয়ে তিনি যেন অনুভব করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নরেনের মতো শরীরচর্চা করা ভক্তদের ধ্যানজপের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত খাওয়াকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, মা সত্য গর্ভধারিণীর মতো ফোঁস করে উঠেছেন। কারণ সন্তানের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে যাতে ধর্ম, মোক্ষ প্রাপ্তির বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তা দেখার দায়িত্ব একান্ত মায়ের।

এরপর ঠাকুরকে কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় রাখার সময়ও শ্রীশ্রীমা সেই সব জায়গায় থেকেছেন। কিন্তু তিনি লজ্জাশীলা পবিত্রতায় পরিপূর্ণ ভারতীয় নারী, তাই নরেনের সঙ্গে নানা বিষয়ে ভাববাচ্যে কথা হলেও নরেন মায়ের মুখাবয়ব দর্শন করেননি বললেই চলে। যেদিন নরেনরা প্রথম ভিক্ষা করতে বের হয় শ্রীমা-ই প্রথম ভিক্ষা দেন।

ঠাকুরের শরীর চলে যাওয়ার পর মাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নরেনের ব্যস্ততা দেখার মতো ছিল। যা করেছেন সব মাকে জিজ্ঞাসা করে। যখন অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে বহু দিনের জন্য ভারত ভ্রমণে বের হবেন, তখন মা হাওড়ার ঘুষুড়িতে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। সেখানে গিয়ে মাকে গান শুনিয়ে খুশি করে পরিব্রাজকের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

ঠাকুর দর্শনকে মায়ের লিখিত আদেশনামার মাধ্যমে পরীক্ষা করে বিদেশযাত্রা করেন। সেখান থেকে স্বামীজী বারবার মায়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে গুরুভাইদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন।

ভারতে ফিরে এসেও খুব সন্তর্পণে পূর্ণ পবিত্রতা বজায় রেখে মায়ের সঙ্গে দেখা করতেন, কিন্তু প্রতিবারই 'চরণযুগল সার'।

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ থেকে কয়েকজন গুরু ভাইদের নিয়ে নৌকোতে বাগবাজারে মাতৃদর্শনে যাচ্ছেন। ক্রমাগত গঙ্গার জল নিজ শরীরে দিচ্ছেন ও পান করছেন। তারক জিজ্ঞাসা করায় বলেন যে, তিনি স্বীয় শরীর ও মনকে শুদ্ধ করে নিচ্ছেন। শ্রীমা জানতে পেরে ঘোমটা দিয়ে ঘাটের উপর বসেছেন। স্বামীজী মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন পাদস্পর্শ না করে। অন্যদেরও ঐরূপ নির্দেশ দেন। কারণ পাদস্পর্শ করলে শ্রীমা তাদের অশুদ্ধ মনের সকল দোষ নিজ মনে গ্রহণ করবেন, ফলে তাদের জন্য মাকে কষ্টভোগ করতে হবে। পবিত্রতা স্বরূপিণী মা। অবশ্য শ্রীমা অন্যত্র বলেছেন, 'ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুয়ে মুছে কোলে নিতে হবে।'

গঙ্গা পার হয়ে স্বামীজী এসেছেন মাতৃদর্শনে

বিদেশী শিষ্যাদের নিয়ে নরেন বাগবাজারে মায়ের কাছে গেছেন। মায়ের পবিত্রতার আগুনে তাদের তাতিয়ে নেওয়ার জন্য। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে নিজে মায়ের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে শিখিয়েছেন কীভাবে মায়ের আশীর্বাদ নিতে হয়। আরও কয়েকটি ঘটনা গল্প হলেও সত্য বলে মনে হয়। প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছ থেকে কয়েকটি পয়সা নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে মাতৃদর্শনে এসেছেন। মাকে প্রণাম করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীমা যোগেন মাকে জিজ্ঞাসা করছেন—'নরেন কি চায়?' উত্তরে স্বামীজী বলেন আমি ঠাকুরের কাজ করতে চাই। শ্রীমা বলেন—'ঠাকুরের কাজ করতেই তুমি এসেছ।'

এই বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ শেষ জীবনে বেলুড় মঠের জমি কিনে মন্দির স্থাপন করেন। শ্রীমা তখন নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে থাকতেন। শ্রীমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে উক্ত স্থানে নিয়ে আসেন। সেদিন মা ঠাকুরের পুজো করেন। স্বামীজী নিজেকে অত্যন্ত ধন্য মনে করেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে গুরুভাইদের বলেন—এখানে জ্যান্ত দুর্গার পূজা করব। এটি কার্যে পরিণত করেন।

১৯০১ সালে দুর্গাপূজায় মাকে মঠে নিয়ে এসে নিজে অসুস্থ হয়ে ঘরে শুয়ে রইলেন, যাতে মায়ের উপস্থিতিতে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব প্রকাশিত না হয়ে পড়ে। আবার পূজা শেষে ব্রহ্মচারীকে দিয়ে মায়ের দক্ষিণান্ত করাচ্ছেন। এ কি জ্যান্ত দুর্গার পূজা নয়?

শুধু চর্মচক্ষু দর্শন সব নয়। জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দর্শন করে শ্রীশ্রীমাকে যেভাবে স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, সেভাবে অত দ্রুত কেউই বুঝে উঠতে পারেননি।
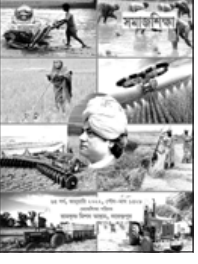
কবিতামালা

দেশনায়ক ❀ অনিমেষ রায়

পরাধীন ভারতের স্বাধীন সেনানায়ক
বিশ্ববন্দিত নেতাজী সুভাষ,
আপসহীন ধারার স্বাধীনতা সংগ্রামী
বিপ্লবী চেতনার শ্রেষ্ঠ উদ্ভাস।

চেতনার আকাশে বীরত্বের কাহিনী——
ধ্রুবতারাসম বিরাজমান,
পরাক্রম ও প্রেরণার মহান প্রতিভূ
অপরাজেয় আবহমান।

জাতীয় ইতিহাসের গর্বিত নেতা
আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক,
স্বমহিমায় উদ্ভাসিত সকল প্রান্তর——
জাতীয়তাবাদের বার্তাদায়ক।

আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানে
প্রকল্পের গভীরে অনুধাবন,
সমৃদ্ধশালী ভারত গঠনের স্বপ্নে
দিগন্তবিস্তৃত পরিক্রমণ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সেনাপতি
স্বদেশপ্রেমের সুসম্মত প্রতীক,
ব্রিটিশমুক্ত শোষণহীন সমাজ গঠনে
সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বপথিক।

ভবান্যষ্টকম্ ❀ স্বামী বরেশ্বরানন্দ

নাই আমার পিতা, মাতা, বন্ধু কিংবা দাতা।
নাই আমার পুত্র, কন্যা, ভৃত্য কিংবা ভর্তা।।
নাই আমার জায়া, বিদ্যা কিংবা কোনো বৃত্তি।
হে মা ভবানি, তুমিই আমার একমাত্র গতি।।

অপার সংসার সাগরে, মহাদুঃখে ভীত আমি।
বাসনাগ্রস্ত, লোভযুক্ত, আর বুদ্ধিশূন্য আমি।।
কুৎসিত সংসারবন্ধন থেকে চাহি আমি মুক্তি।
হে মা ভবানি, তুমি দাও আমার অন্তরে শক্তি।।

না জানি আমি দান, না জানি ধ্যান যোগ।
না জানি কোনো তন্ত্র মন্ত্র, না জানি কোনো স্তোত্র।।
না জানি কোনো পূজা, না জানি ন্যাসযোগ।
হে মা ভবানি, দূর কর আমার সংসার ভোগ।।

না জানি কোনো পুণ্য, না জানি কোনো তীর্থ,
না জানি কোনো মুক্তি, বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ।।
না জানি কোনো ভক্তি, না জানি কোনো ব্রত।
হে মা ভবানি, তুমি আমায় মুক্ত কর দ্রুত।।

না চাই হতে কুকর্মী, কুসঙ্গী, কুদাস, কুবুদ্ধি,
না জানি কুল আচার, আমি কদাচার লীন।।
দূর হোক কুদৃষ্টি, কুবাক্য, আর সংসার বন্ধন।
হে মা ভবানি, তুমি আমায় কর সর্বদা রক্ষণ।।

না জানি আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কিংবা ইন্দ্র।
না জানি কোনো দেবতাকে, হোক সূর্য কিংবা চন্দ্র।।
বিপদকালে তুমি মা সকলের আশ্রয় এই জানি।
হে মা ভবানি, পুনঃ পুনঃ তোমায় আমি প্রণমি।।

না যেন ভুলি, বিবাদে, বিষাদে, প্রমাদে, প্রবাসে,
জলে কিংবা অনলে, পর্বতে কিংবা শত্রুমধ্যে,
গভীর অরণ্যে, আছ তুমি বা শরণদায়িনী।
তুমি আমার একমাত্র গতি, হে মা ভবানি।।

হই যদি অনাথ, দরিদ্র, কিংবা জরারোগগ্রস্ত।
হই যদি ক্ষীণ, অতি দীন, তোমার নাম করতে ব্যর্থ।।
যদি থাকি সর্বদা বিপদে মগ্ন, সর্ব প্রকারে হই বিনষ্ট।
জানি হে মা ভবানি, তুমি সর্বদা আমার উপর তুষ্ট।

(ভবান্যষ্টকম্ থেকে সংগৃহীত)

আনন্দ ❀ রমেন রায়

আনন্দ আছে নীল আকাশে
চেয়ে থেকো বুঝতে পারবে।
আনন্দ আছে নদীর পাড়ে
হেঁটে দেখো, বুঝতে পারবে।

আনন্দ আছে ভোরের আলোয়
গায়ে মেখে দেখো, বুঝতে পারবে।

আনন্দ আছে সবুজ ঘাসে
মাড়িয়ে দেখো, বুঝতে পারবে।

আনন্দ আছে ধূলিকণায়
গড়িয়ে দেখো, বুঝতে পারবে।

আনন্দ আছে গাছের নীচে
দাঁড়িয়ে থেকো, বুঝতে পারবে।

আনন্দ আছে দুঃস্থের সেবায়
করে দেখো, বুঝতে পারবে।
আনন্দ আছে মায়ের কোলে
শুয়ে দেখো, বুঝতে পারবে।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

স্বামীজী চেয়েছিলেন 'নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।' সেই ভারত আরো অনেক বেশি এগিয়ে চলেছে দ্রুত বেগে। আগে একটা সময় ছিল যখন বহির্জাতির শাসন-শোষণে ভারত এমন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে, একদা সর্বোচ্চ কৃষি সমৃদ্ধ দেশ হয়েও খাদ্যসামগ্রী বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়েছে। কিন্তু সেই ভারত এই কৃষিজীবী, চাষাভুষোদের হাত ধরে বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্বাবধানে দ্রুতবেগে এগিয়ে আজ সারা বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। পিছিয়ে পড়া অন্য দেশগুলিকে খাদ্যসামগ্রী দিয়ে এই ভারত শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্তির কাছাকাছি অবস্থান করছে। চাষে নূতন ধরনের বীজের ব্যবহার, নিত্য নূতন মেশিনের ব্যবহার কৃষি পদ্ধতিকে আরো উন্নততর করেছে। পাওয়ার টিলার, ঘাস নিড়ানি মেশিন, ড্রোন স্প্রে মেশিন, ট্রাক্টর প্রভৃতি নানা ধরনের উন্নত মেশিন কৃষকদের সমৃদ্ধ করেছে। চাষী বা কৃষকদের ভেতরের কর্মক্ষমতাকে আরো বেশি প্রয়াসে সহায়তা করেছে। স্বামীজীর ভাবনায় 'জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।' সমাজ-রূপ পক্ষীর দুটি ডানার মতো নারী ও পুরুষের কৃষিতে সমভাবে যোগদান ভারতের কৃষিকে শক্তিশালী করেছে। নারীরা ভারতের কৃষিতে চিরদিন যুক্ত ছিলেন কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট কাজে যুক্ত রাখা হতো, যন্ত্র আবিষ্কারের পরে ভারতের মহিলারা ট্রাক্টর চালনা, নিড়ানি মেসিন চালনা, সব রকম চালনায় সিদ্ধহস্ত হওয়ায় মা লক্ষ্মীর কৃপা ভারতের কৃষিজগতে বর্ষিত হয়েছে। ভারতীয় চাষে যান্ত্রিকীকরণ ও মহিলাদের দৃঢ়ভাবে সংযুক্তিকরণ-এর ফলে স্বামীজীর 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'-এর স্বপ্নপূরণ পথে এগিয়ে চলেছে। কৃষিনির্ভর নূতন ভারতের দৃঢ় প্রদক্ষেপের চিত্র এই প্রচ্ছদে প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে।
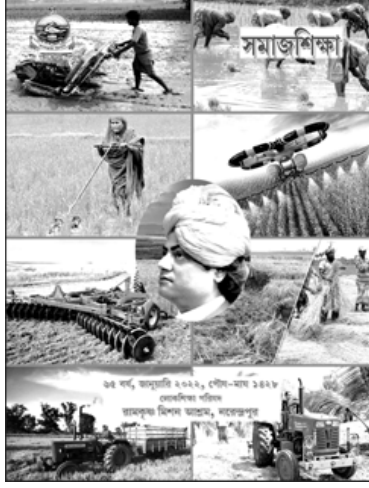
(লিখন ঃ রণজয় গাঙ্গুলী, অলঙ্করণ ঃ কমল রথ)

৪৭তম সংস্থা সচিব সম্মেলনে (২০২১) সন্ন্যাসি–ব্রহ্মচারিবৃন্দ

Volume-65
SAMAJSIKSHA

January 2022
Issue-X
পৌষ–মাঘ ১৪২৮

Postal Regd. No. SP/005/2021-2023
Regd. No. RNI-5155/59
Price : 20.00